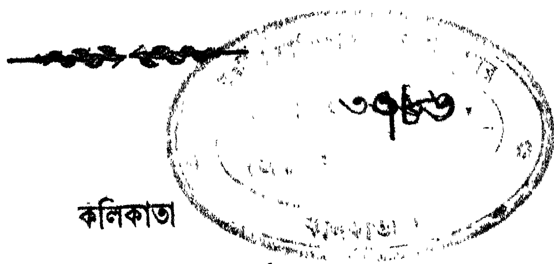
ওঁতৎসৎ।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী—১১

ওঁ পিতা নোঽসি।

(তুমি আমাদের পিতা)



কলিকাতা

৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, (পূর্ব্বদ্বার)

হইতে

শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

 সন ১৩২১ সাল। [মূল্য ।৵০ মাত্র]

আত্মপরিচয়।

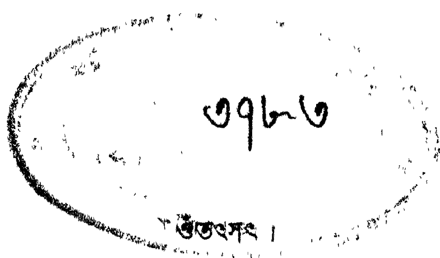
৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র,
৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ :সম্পাদক, জ্ঞান ও
ধর্ম্মের উন্নতির লেখক, এবং অধ্যাত্মধর্ম্ম ও
অজ্ঞেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, আর্য্যরমণীর
শিক্ষা ও স্বাধীনতা, অভিব্যক্তিবাদ,
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি, আলাপ,
আঁখিজল, শ্রীভগবৎকথা,
প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা,
কলিকাতা, যোড়াসাঁকো
নিবাসী, শাণ্ডিল্যগোত্র শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ
ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত "ওঁ পিতা নোঽসি"
গ্রন্থ ১৯৭১ সম্বতে ১৮৩৬ শকে ৫০১৪ কলিগতাব্দে
৮৫ ব্রাহ্মসম্বতে মকর রাশিস্থভাস্করে মাঘমাসে ১১ই দিবসে
শুক্লপক্ষে শুভ দশমী তিথিতে সোমবাসরে প্রকাশিত হইল

কলিকাতা

৫৫, আপার চিৎপুর রোড,—আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩২১ সাল।


ওঁ
আমাকে
তোমায়
দিয়াছি
তোমাকে
আমায়
দাও

অনুক্রমণিকা।



ওঁ পিতা নোঽসি।

প্রথম ভাব—ঈশ্বর স্রষ্টা ও পিতা।

যে বৈদিক মন্ত্রে আমরা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া আমাদিগের প্রতিদিবসের উপাসনা কার্য্য আরম্ভ করি, সেই বৈদিক মন্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে সেই দেবাধিদেব পরমেশ্বর আমাদিগের পিতা। সেই কোন সুদূর অতীতকালে বৈদিক ঋষিগণ ভগবৎস্তুতির পুণ্যধ্বনিতে মনোরম তপোবন সকল মুখরিত করিয়া ওঁ পিতা নোঽসি এই প্রাণপ্রদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণারাম পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া কত না আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও আজ আবার কালের সুমহান ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া সেই হৃদয়নাথ পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া কি অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এস, আমরা সকলে ঋষিদিগের সঙ্গে সমস্বরে প্রাণ ভরিয়া বলি—

ওঁ পিতা নোঽসি মন্ত্র।

ওঁ পিতা নোঽসি—তুমি আমাদের পিতা।

প্রাণের পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকা কিছু নূতন কথা নহে। বৈদিক ঋষিগণই যে তাঁহাকে পিতা বলিয়া সর্ব্বপ্রথম ডাকিয়াছিলেন তাহা নহে। জগতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগতের প্রত্যেক পরমাণু সেই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও নির্ব্বহিতা পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই আদিকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেক পরমাণু হইতে পরমেশ্বরের প্রতি পিতা বলিয়া আহ্বান সমধারে উত্থিত হইতেছে—সে আহ্বানের বিরাম নাই।

আদিকাল অবধি পিতা বলিয়া আহ্বান।

আমাদিগের এই চর্ম্মচক্ষু দিয়া দেখিলে বা চর্ম্মকর্ণ দ্বারা শুনিতে ইচ্ছা করিলে চলিবে না—তাহা হইলে আমরা জগতের সেই মহান্ আহ্বানগীত কিছুতেই শুনিতে পাইব না। আমাদিগের অন্তরে যে জ্ঞানচক্ষু আছে এবং যে জ্ঞানকর্ণ আছে, সেই বিশ্বসঙ্গীত শুনিতে চাহিলে সেই জ্ঞানচক্ষু ও জ্ঞানকর্ণকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। কোলাহলপূর্ণ জগতের বৃথা কলরব হইতে এই চর্ম্মাচ্ছাদিত চক্ষু ও কর্ণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। জগতের ছোটখাটো বিষয়সমূহ হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লইতে হইবে, তবে জগতের গভীর অন্তর হইতে যে আহ্বানগীত ভগবানের চরণাভিমুখে নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, সেই মহান্ উদার আহ্বানগীত শুনিবার আশা করিতে পারি। আমাদের অন্তরের চক্ষুকর্ণকে জাগাইয়া তুলিলেই আমরা শুনিতে পাইব যে সেই আদিকাল হইতে এবং সেই অনাদিকাল হইতে জগতচরাচর ভেদ করিয়া, শতকোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রসকল ভেদ করিয়া, সম্মুখে

জ্ঞানকর্ণ দ্বারা বিশ্বসঙ্গীত শুনিতে হইবে।

প্রসারিত অনন্তবিস্তৃত এই মহাব্যোম ভেদ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিবার এক মহান্ আহ্বানগীত, একটী মহানাদ উত্থিত হইতেছে।

তবে বৈদিক মন্ত্রের প্রাধান্য কোথায়? এই মন্ত্রে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিবার সেই সুগভীর অব্যক্ত আহ্বান-গীতকে ব্যক্ত আকার দিয়াছেন, সেই অব্যক্ত মহানাদকে মূর্ত্তিমান করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সমগ্র জগত যে কথাটীকে বলি বলি করিয়াও স্পষ্টরূপে বলিতে পারে নাই, ঋষিরা সেই কথাটী সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদিগকে সেই আহ্বানগীত প্রত্যক্ষ শুনিবার অধিকার দিয়াছেন, এইখানেই সেই বৈদিক মন্ত্রের মাহাত্ম্য ও নূতনত্ব। ঈশ্বর যেমন নিত্য নূতন, এই বৈদিক মন্ত্রও সেইরূপ চিরনূতন। এই মন্ত্রের মৃত্যু নাই। ঋষিরাও এই বেদমন্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ে এক নূতন বল লাভ করিয়াছিলেন; আমরাও এই বেদমন্ত্রে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া এক আশ্চর্য্য নবশক্তিতে অভিষিক্ত হইতেছি। •

আহ্বান গীতের ব্যক্ত আকার দেওয়াতেই বৈদিক মন্ত্রের নূতনত্ব।

ঈশ্বর আমাদিগের পিতা। তাঁহাকে আমরা পিতা বলিয়া ডাকি কেন? তিনি জগতচরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং আমাদিগেরও স্রষ্টা, তাই তিনি আমাদিগের পিতা। তিনি সৃষ্টির আদিকালে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, তাহারই ফলে এই কোটী কোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের উৎপত্তি হই-

ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ও পিতা।

য়াছে ও হইবে এবং তাহারই ফলে এই বিশ্বধারিণী পৃথিবীতে জীবজন্তুমানবেরও উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। তাই মূলে দেখিলে তিনিই আমাদিগের স্রষ্টা ও জন্মদাতা এবং সেই কারণে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আনন্দিত হই। ইহলোকে যিনি আমাদিগের পিতা তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি, কারণ তিনি আমাদিগের জন্মদাতা। যাঁহা হইতে আমরা আমাদিগের শরীর মন ও আত্মার গঠন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার রক্তে ও তেজে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে তাঁহাকে আমরা জন্মদাতা পিতা বলিয়া আনন্দলাভ করিব এবং তাঁহার পুত্র বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিব। এখন, যাঁহার ইচ্ছাতে আমি আমার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার ইচ্ছাতে আমার পিতা অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার ইচ্ছাতে আমার পিতারও পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই নিজ নিজ অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; যাঁহার ইচ্ছাতে আমরা সকলেই শরীরের মূল কারণ প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি কেবলমাত্র আমার নহেন, কিন্তু এই সমুদয় জগতচরাচরের স্রষ্টা ও মূল জন্মদাতা। তাঁহার নামে যে আমরা গৌরব অনুভব করিব, তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া যে একটা বিপুল আনন্দ লাভ করিব, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা। এই সৃষ্টিকার্য্যটা কি? বৃদ্ধ জ্ঞানী আচার্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন যে অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা

সৃষ্টি ব্যাপারটা কি?

কোন বস্তুর উৎপাদন করিবার নাম স্বষ্টি। একটা বৃক্ষ কাটিয়া তাহা হইতে বড় বড় কতকগুলি তক্তা প্রস্তুত করিলাম এবং সেই সকল তক্তা হইতে দরজা জানালা বাক্স প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু সকল নির্ম্মাণ করিলাম—এপ্রকার কার্য্যকে স্বষ্টি বলে না। কোন পদার্থের সাহায্য না লইয়া কোন কিছু প্রস্তুত করিতে পারিলেই তাহাকে স্বষ্টি বলা যায়। আমরা কোন কিছুরই সৃষ্টি করিতে পারি না, কারণ আমরা যাহা কিছু প্রস্তুত করিব তাহা একটা না একটা কিছুর সাহায্য বা অবলম্বন লইয়া করিব—বিনা সাহায্যে করিতে পারিব না। তবে আমাদিগের কোন কোন কার্য্যে আমরা স্বষ্টির আভাস পাইতে পারি মাত্র। আমার ব্রহ্মনাম প্রচারে একান্ত ইচ্ছা হইল এবং সেই ইচ্ছা আমার মুখ হইতে ব্রহ্মনামগানে ব্যক্ত আকার ধারণ করিল। আমার সেই জ্বলন্ত ভাষায় ব্রহ্মনামগান শ্রবণ করিয়া লোকেরা দলে দলে ভক্তিপথের পথিক হইতে লাগিল। আমার সেই এক তীব্র ইচ্ছা হইতে কেমন সুন্দর একটী ভক্তিপথের স্বষ্টি হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতে অতি সামান্য ভাবে স্বষ্টির একটুকু আভাস পাই মাত্র—অব্যক্ত ইচ্ছা যে কি প্রকারে ব্যক্ত আকার ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান হইতে পারে, সেই তত্ত্বের ইঙ্গিতটুকু মাত্র পাই। কিন্তু এস্থলেও আমার ইচ্ছা একটা কোন কিছুর, যাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম তাহারই অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি অন্যবিধ। সে স্বষ্টিতে অন্য কোন উপাদানের সাহায্য লওয়া নাই, তাহাতে তাঁহার আপনাকে ছাড়া অন্য কোন কিছুরই অবলম্বনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার সমান যখন দ্বিতীয় কেহ নাই এবং তিনি যখন অনাদ্যনন্ত,

তখন তাঁহার নিত্য বর্ত্তমান ইচ্ছা ও তাহা হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি অপর কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া সম্ভবিতে পারে না।

জগৎস্রষ্টা যিনি, তিনি ইচ্ছাময় প্রাণময় অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বর। তিনি জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ইচ্ছাই প্রাণরূপে ব্যক্ত হইয়া সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার সেই নিত্য বর্ত্তমান ইচ্ছার বলেই এই জগতচরাচর নিত্য উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই প্রাণ, ইচ্ছা প্রভৃতি আসিয়াছে।

এই কারণেই প্রাণের আবির্ভাব, ইচ্ছার আবির্ভাব প্রভৃতিকে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করি। এই প্রাণ, ইচ্ছা প্রভৃতি পাইলে আমরা তাহাদিগকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিয়া বিভিন্ন আকার ও গঠন প্রদান করিতে পারি, কিন্তু এগুলি না পাইলে ইহাদিগের জন্মদান করিতে পারি না। ঈশ্বরের আত্মগত ইচ্ছারই বলে এগুলি জগতে নামিয়া আসিয়াছে।

ইহলোকে পিতামাতা সাক্ষাৎভাবে জন্মদাতা হইলেও মূলে ঈশ্বরই আমাদিগের জন্মদাতা। তাঁহার ইচ্ছাতে এই আকাশে প্রাণসঞ্চার না হইলে কোথায় বা আমরা থাকিতাম, আর কোথায় বা আমাদের পিতৃপুরুষগণ থাকিতেন? ঈশ্বর যখন আমাদের জন্মদাতা, তখন কাজেই তিনি আমাদের পিতাও বটে। তিনি যে প্রাণ জগতে বিছাইয়া আমার জন্মগ্রহণের হেতু হইয়াছেন, সেই প্রাণ ঢালিয়া দিবার কারণেই তিনি সমগ্র জগতেরও জন্মগ্রহণের কারণ হইয়াছেন। এই কারণে তিনি যেমন আমার পিতা, সেইরূপ জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুরও পিতা। ভাবিলে কি প্রকার আত্ম-

ঈশ্বর জগতের পিতা।

হারা হইয়া পড়িতে হয় যে আমরা সূর্য্যের একটী রশ্মিকণার সমান সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত মনুষ্য—আমাদেরও যিনি পিতা, তিনিই আবার এই সূর্য্যের সমান এবং সূর্য্য অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃহত্তর কোটী কোটী সূর্য্যেরও স্রষ্টা ও পিতা। এই সমগ্র জগৎসংসার আমারই পিতার রাজ্য! এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের আমরাই উত্তরাধিকারী! আমাদের দুঃখদৈন্য কোথায়, আর কোথায় বা আমাদের ভয় শোক?

বৈদিকমন্ত্রে ঈশ্বরকে অর্ঘ্য প্রদান।

এস, আমরা ঋষিদিগের সঙ্গে একতানে একহৃদয়ে গৌরবের সহিত ঘোষণা করি যে আমরা সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের সন্তান। এস, তাঁহাকে প্রতিদিন হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ওঁ পিতা নোঽসি এই বৈদিকমন্ত্রে পূজার্ঘ্য প্রদান করি। আমাদিগের শরীরে বলাধান হউক, হৃদয়ে তেজ আসুক এবং আত্মা প্রসন্ন হউক ও অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হউক।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা
নোঽসি গ্রন্থে ঈশ্বর স্রষ্টা ও পিতা বিষয়ক
প্রথম ভাব সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

দ্বিতীয় ভাব—ঈশ্বর জগতপাতা ও পিতা।

ঈশ্বর আমাদের পিতা। তিনি যেমন জগত চরাচরের স্রষ্টা বলিয়া পিতা, সেইরূপ তিনি জগতসংসারের পাতা, পালনকর্ত্তা বলিয়াও পিতা। এখানে সাধারণতঃ দেখা যায় যে জন্মদাতা পিতা কেবলমাত্র সন্তানের জন্মদান করেন বলিয়াই যে সন্তানেরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আনন্দ লাভ করে, সন্তানদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা পিতার চরণে ছুটিয়া যায়, তাহা নহে। জন্মদাতা পিতা সন্তানের পালনকর্ত্তা, শৈশব অবধি সন্তানের লালন-পালনের সুব্যবস্থা করেন এবং সেই সুব্যবস্থা করিতে গিয়া নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন না, প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না, সেই কারণেই পিতার প্রতি সন্তানের ভক্তিশ্রদ্ধা এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সন্তান পিতার নামে এত গৌরব করিতে চাহে। ঈশ্বরও যদি কেবলমাত্র এই জগতচরাচরের সৃষ্টি করিয়া, ইহার জন্মদানমাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কি আমাদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইত? তাঁহার জগতরচনার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া, তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা খুবই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের গভীর প্রীতি তাঁহার প্রতি কখনই ছুটিয়া যাইত না।

ঈশ্বর জগতের কেবলমাত্র স্রষ্টা নহেন।

কেবলমাত্র জগতস্রষ্টা পরমেশ্বরকে আমরা ভয় করিতে পারি, তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা অবাক হইতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না, তাঁহাকে পিতা বলিয়া বন্ধু বলিয়া প্রাণের ভিতর টানিয়া বসাইতে

ঈশ্বর জগতের পাতা ও পিতা।

পারি না। আমাদিগের ঈশ্বর জগতের স্রষ্টামাত্র নহেন, তিনি জগতের পালনকর্ত্তা ও পিতা। তিনি আমাদিগের শরীর মন ও আত্মার লালনপালনের কত-না সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যেমন আমাদিগের শরীর রক্ষার জন্য অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ আমরা দুঃখে কষ্টে পড়িয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলে তিনি আমাদিগের চক্ষের জলও মুছাইয়া দেন। আবার যখন পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্মা অবসন্ন হইয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হয়, তখন তিনি আত্মাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার পাপতাপ সকলই দূর করিয়া দেন। তিনি কেবলমাত্র জগতের স্রষ্টা হইলে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া কোনমতেই প্রাণপ্রদ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম না।

তাঁহার পালনী ব্যবস্থা সর্ব্বত্র।

পরমেশ্বর আশ্চর্য্য কৌশলপরিপূর্ণ ও আশ্চর্য্য নিয়মসমূহে নিয়ন্ত্রিত এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিমাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহার এই বিশ্বসংসারে যে সকল প্রাণী জীবজন্তু প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলের এবং প্রত্যেকের লালনপালনের সুব্যবস্থা তিনি বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পালনীমূর্ত্তিতে তাঁহার আকাশের ন্যায় গভীর প্রেম জগতের বিন্দুতে বিন্দুতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, মাখাইয়া রাখিয়াছেন। যেদিকে ফিরিয়া দাঁড়াই, তাঁহারই প্রেমহস্তের স্পর্শ পাই। যে নিশ্বাসটি গ্রহণ করি, তাহা বুকের ভিতরে তাঁহারই কোমল হস্তের স্পর্শ জানিয়া রাখি মাত্র। কোনদিকে কোনপ্রকারে তাঁহার প্রেমহস্ত এড়াইয়া, তাঁহার পালনী ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া কেহই বাঁচিতে পারে না।

ঈশ্বর জগতসৃষ্টির আদিকাল অবধি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের প্রয়োজন জানিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন বলিয়াই সমগ্র জগতের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং জগতের ভক্তি শ্রদ্ধা স্বভাবতই তাঁহার প্রতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার প্রেম পালনীমূর্ত্তিতে বিশ্বসংসারকে ছাইয়া রহিয়াছে বলিয়াই জগতের অন্তরতম প্রদেশ হইতে পিতা বলিয়া আহ্বান তাঁহার চরণাভিমুখে উত্থিত হইতেছে এবং তাঁহার পূজার মঙ্গলশঙ্খ দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে। একদিকে তাঁহার প্রেম নীরব পদক্ষেপে পালনীমূর্ত্তিতে আকাশ হইতে নামিতেছে এবং অন্যদিকে জগতের প্রেম ভক্তিশ্রদ্ধামূর্ত্তিতে নীরবে তাঁহারই চরণের দিকে উত্থিত হইতেছে—এইরূপে উভয় প্রেম মিলিত হইয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এক অপূর্ব্ব প্রেমস্তম্ভ রচিত হইতেছে।

ঈশ্বরের প্রেম ও জগতের প্রেম মিলিয়া প্রেমস্তম্ভের সৃষ্টি।

ঈশ্বর পিতার সন্তানপালন কার্য্যে জগতসংসারের প্রতি তাঁহার গভীর প্রেম ও পালনীভাবের সর্ব্বপ্রধান পরিচয় দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পিতার হৃদয়ে এমন একটী প্রেমকণা বসাইয়া দিয়াছেন যে পিতা শত সহস্র বিপদআপদ অগ্রাহ্য করিয়াও সর্ব্বাগ্রে আপনার সন্তানের লালনপালনের ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠেন। সেই প্রেমেরই বলে পিতার কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের মধ্যে সন্তানপালন সর্ব্বাপেক্ষা অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ অংশ হইয়া পড়িয়াছে।

পিতার সন্তানপালনে ঈশ্বরের প্রেমের সর্ব্বপ্রধান পরিচয়।

সন্তানপালন পিতার কেবলমাত্র কর্ত্তব্য নহে, পিতার নিকট এই কার্য্য অতি স্বাভাবিক। পিতার হৃদয় আপনা হইতেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রসর হয়। পিতার পক্ষে এই কার্য্য এতদূর স্বাভাবিক যে ইহার বিপরীতে কোন পিতাকে সন্তানপালনে বিমুখ দেখিলে আমাদের চক্ষে তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলিয়া মনে হয় এবং আমরা সেই পিতার প্রতি নানা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। আবার যখন দেখি যে কোন পিতা তাঁহার সন্তানদিগের লালনপালনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন, সুন্দর সুপুষ্ট পুত্রকন্যাগণ তাঁহার চরণ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন সেই পিতার প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কেমন সহজেই ছুটিয়া যায়—সেই ছবি আমাদিগের নিকট কেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

সন্তানপালন পিতার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য।

সন্তানপালন কার্য্য আমরা পিতার পক্ষে এতদূর স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লই যে অনেকস্থলে আমাদের কেবলমাত্র পালনকর্ত্তাকেও আমরা পিতা বলিয়া ডাকিয়া থাকি। ঘটনাচক্রে হয়তো জন্মদাতা পিতা আপনার সন্তানদিগের লালনপালনে অসমর্থ হইলেন। জন্মদাতা পিতা হয়তো অসময়ে দেহত্যাগ করিলেন, অথবা বাধ্য হইয়া বহুকাল যাবৎ বিদেশে রহিলেন, কাজেই তিনি আপনার সন্তানদিগের লালনপালনের সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, এরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে বড় বিরল নহে। এই অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় যে সন্তানদিগকে তাহাদের জন্মদাতা পিতার কোন আত্মীয় বা বন্ধু লালনপালন করেন। তখন, ভগবান যে প্রেম

পালনকর্ত্তাকে পিতা বলা যায়।

দিয়া তাঁহার সংসারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রেমের বলে সেই পালনকর্ত্তার স্নেহ যেমন সেই সন্তানদিগের উপরে নামিয়া আসে, সন্তানেরাও সেইরূপ সেই পালনকর্ত্তাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহারই চরণে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

সন্তানবাৎসল্যেই জীবরক্ষার উপায়।

সন্তানের প্রতি জন্মদাতা পিতার তীব্র ভালবাসা এবং সন্তানদিগকে লালনপালন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা কেবল মনুষ্যমাত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্য অবধি ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত সকল প্রাণীরই মধ্যে সন্তানবাৎসল্য স্বাভাবিক ভাবে জাগ্রত থাকিতে দেখা যায়। এই সন্তানবাৎসল্য থাকাতেই জীবপ্রবাহ রক্ষা পাইতেছে এবং জীবগণ উন্নতির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছে।

সকল প্রেমের মূল উৎস এক ও অখণ্ড

মনুষ্যই বল আর কীটাণুই বল, সকল প্রাণীরই মধ্যে সন্তানবাৎসল্য খোদিত হইয়া রহিয়াছে। এই যে সন্তানবাৎসল্য কোটী কোটী যুগ ধরিয়া প্রাণীগণের মধ্যে সমান ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, ইহার মূল প্রস্রবণ এক ও অখণ্ড না হইলে কি ইহা এই বিরাট আকাশ এবং এই বিশাল কাল ব্যাপ্ত করিয়া এরূপ অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারিত? কেবল আপনার সন্তানের প্রতি জন্মদাতা পিতার মমতা নহে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে অপরের পুত্রের প্রতি পালনকর্ত্তার যে স্নেহমমতার অস্তিত্ব বিষয়ে উপরে বলিয়া আসিয়াছি, অবস্থা বিশেষে খাদ্যখাদকসম্বন্ধবিশিষ্ট অন্যান্য জীবজন্তুগণেরও মধ্যে সেই মমতার অস্তিত্ব দেখা গিয়া থাকে।

সিংহের খাচার ক্ষুদ্র কুকুরকে ফেলিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রাণভয়ে ভীত কুকুরকে সিংহ আপনার আহারের অংশ দিয়াও পালন করিয়াছে। এই বাৎসল্যমূলক পালনীভাবের মূল প্রস্রবণ একটীমাত্র না হইলে সেই ভাব সকল প্রাণীরই মধ্যে কেমন করিয়া সমান ভাবে কার্য্য করিতে পারিল? আরও একটী কথা এই যে, কোথায় কোন্ জীবজন্তু নিজের সন্তানকেই হউক বা অপর কোন জীবজন্তুকেই হউক, স্নেহভক্তি ভালবাসা দেখাইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম; আমরা কোন জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা দেখাইলাম, সে তাহা ভালবাসা বলিয়া বুঝিতে পারিল; এই সকল স্নেহ ভালবাসার মধ্যে এরূপ একটী একতা হইতেই কি বোঝা যায় না যে এই বিশ্বব্যাপী বাৎসল্য ও পালনীভাবের মূল প্রস্রবণ একই? সেই এক ও অদ্বিতীয় মূল উৎস একমাত্র অনন্ত পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে হইতে পারেন? অনন্ত বিশ্বকে যিনি ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অনন্ত কালকে যিনি ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সেই পরমেশ্বর ব্যতীত এই বিশ্বব্যাপী ও অনন্তকাল-

ঈশ্বরই প্রেমের একমাত্র মূল উৎস।

ব্যাপী পালনীভাবের প্রেরয়িতা অপর কেহই হইতে পারেন না। সেই মূল উৎস হইতে এই পালনীভাব নামিয়া আসিয়া সমুদয় জগতকে মধুময় ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারই বিরাট বিশাল প্রেমেরই একটী কণামাত্র পাইয়া আমাদিগের পিতামাতা আমাদিগের উপর কি অগাধ স্নেহ-প্রীতিই না ঢালিয়া দেন। ঈশ্বরের প্রেম শস্য প্রভৃতি আহার্য্যের আকারে, জলের আকারে সুব্যক্তভাব ধারণ করে, আর আমাদের পিতামাতা সেই সকলের ক্ষুদ্রাদপি

ক্ষুদ্রতম একটী অংশের দ্বারা আমাদিগের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "ওঁ পিতা নোঽসি"
গ্রন্থে ঈশ্বর জগতপাতা ও পিতা বিষয়ক
দ্বিতীয় ভাব সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

তৃতীয় ভাব—ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা।

ঈশ্বর জগতের পালনকর্ত্তা ও পিতা, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। তিনি জগতচরাচরের একমাত্র পালনকর্ত্তা ও পিতা বলিয়া সমগ্র জগতের মধ্যে এবং সকল কালের মধ্যে একই নিয়মপ্রণালী কার্য্য করিয়া জগতসংসারকে রক্ষা করিতেছে। সেই কারণেই জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই কারণেই কালেরও অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন অবস্থার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন রক্ষিত দৃষ্ট হয়। কোথায় কোন্ কালে সূর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে—সেই আদি সৃষ্টিকালেও যে নিয়মের বলে সূর্য্যের উষ্ণতেজ বারিপাতের দ্বারা প্রশমিত হইত, আজও সেই একই নিয়মে সূর্য্যের উষ্ণতা বারিপাতে প্রশমিত হইতেছে এবং সেই একই নিয়মে এই পৃথিবীরও উষ্ণভাব বারিপাতের দ্বারা শীতল হইতে চলিয়াছে। আবার সেই একই নিয়মে আমাদেরও শরীর গরম হইলে জলের দ্বারা তাহা শীতল করি। পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জীবজন্তুরাও সেই একই নিয়মে শরীর রক্ষা করে। মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই দেখি যে ক্ষুধা পাইলেই আহারের দ্বারা জীবন রক্ষা করে। কোথায় ঐ সূর্য্য, আর কোথায় এই পৃথিবী—সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, পৃথিবী উত্তপ্ত হইতেছে, পৃথিবীর জল ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার সেই জল শীতল আকারে পৃথিবীর গাত্রে নিপতিত হইয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছে। কোথায় বা সূর্য্য, কোথায় বা ছায়া-

একই নিয়মপ্রণালী জগতসংসার রক্ষা করিতেছে।

পথের অন্তর্গত গঠিতোন্মুখী গ্রহনক্ষত্র সকল, কোথায় বা দূরদূরান্তর-বর্ত্তী ধূমকেতু সকল, আর কোথায় বা আমাদের এই পৃথিবী ও চন্দ্র—আশ্চর্য্য এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডনিহিত প্রতি বস্তুর, প্রতি পরমাণুর মধ্যে এক আশ্চর্য্য শক্তি কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে যথাযথ স্থানে রক্ষাপূর্ব্বক যথানিয়মে পরিচালিত করিতেছে।

পালনী ব্যবস্থার পরিচয়।

ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থার পরিচয় আমরা প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিশ্বাসে পাইয়া থাকি। কোটী কোটী যুগ পরে কবে জগতে জীবজন্তুসকল জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাহাদিগের আলোকের প্রয়োজন হইবে, তাই কোটী কোটী যুগ পূর্ব্বে ঈশ্বর আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র দুইটী আশ্চর্য্য প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলেন। কোটী কোটী যুগের পর কবে মনুষ্যকে রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইবে; প্রচণ্ড শীতের সময়ে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিতে হইবে; বাষ্পীয় শকটে, বাষ্পীয় জাহাজে চাপিয়া চকিতের মধ্যে দেশদেশান্তরে যাইতে হইবে; কলকারখানার সাহায্যে ধরণীর অধিবাসীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইবে, তাই কোটী কোটী যুগ পূর্ব্বে, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে ভগবান ভূগর্ভে পাথুরিয়া কয়লার বিস্তৃত খনি নিহিত করিয়া দিলেন। জীবজন্তুর পিপাসা নিবারণের জন্য জল চাই, তাই কত শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর এই ভূপৃষ্ঠের কোন অংশকে বা উন্নীত করিয়া গগনস্পর্দ্ধী তুষারমণ্ডিত হিমালয়ে পরিণত পূর্ব্বক এবং কোন অংশকে বা জলাশয়ে পরিণত পূর্ব্বক শতসহস্র বৎসর ধরিয়া তাঁহার সংসারে জলের অভাব মোচন করিয়া দিতেছেন। এইরূপে যে দিকেই চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই

তাঁহারই করুণায়, তাঁহারই পালনী ব্যবস্থার জলন্ত পরিচয় দেখিতে পাই।

ঈশ্বরের জগতপালনের কার্য্যপ্রণালীও সমধিক আশ্চর্য্যজনক। সেই কার্য্যপ্রণালীর বিষয়ে যতই আলোচনা করি ততই আশ্চর্য্য হই, স্তম্ভিত হইয়া যাই। নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার মহিমার অন্ত অন্বেষণ করিতে যাই, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসি। তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে এতটুকুও অপচয়ের সম্ভাবনা নাই। তিনি স্বয়ং যেমন অব্যয়, তাঁহার বিশ্বসংসারের গৃহস্থালীতেও সেইরূপ এতটুকু ব্যয় নাই। তাঁহার গৃহস্থালীতে আশ্চর্য্য মিতব্যয়িতা দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যে জলে ধরণী স্নান করিয়া শীতল হইল, সেই জল দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে ধরণীকে বারান্তরে স্নান করাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। আজ যে জল সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘে পরিণত হইল এবং মেঘ হইতে বারিধারায় পরিণত হইয়া পৃথিবীর উত্তপ্ত দেহ শীতল করিল, সেই জলের কতকাংশ বা পরক্ষণেই নদনদীর আকারে দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইল এবং কতকাংশ বা ফলমূলাদির উৎপত্তির সহায়তা করিবার জন্য ভূগর্ভেই সঞ্চিত রহিল। কিন্তু সেই জলের এক বিন্দুও নষ্ট হইতে পাইল না। আমরা যে দ্রব্যকে বিকৃত বা পচা বলিয়া পরিত্যাগ করি, তাহাই আহার করিয়া কতশত জীব প্রাণধারণ পূর্ব্বক জগতের উপকার সাধনে নিরত থাকে। যে দ্রব্য খাইয়া আজ তুমি আপনার জীবন রক্ষা করিলে, তাহাই আবার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অন্যান্য

ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থাতে ব্যয় নাই।

কতশত প্রাণীর আহার্য্যরূপে পরিণত হইয়া তাহাদিগের জীবনধারণের উপায় হয়। ভগবানের সংসারে যেমন অনাবশ্যক একটী পরমাণুরও স্থান নাই, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্ট একএকটী পদার্থের কার্য্যও একমুখী নহে, সহস্রমুখী। তিনি একটী সূর্য্যকে প্রেরণ করিলেন, আর সেই সূর্য্য হইতে এই পৃথিবী, এই গ্রহসকলের উৎপত্তি হইল। আবার সেই সূর্য্যে-রই কার্য্যকারিতার ফলে পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি হইল, পৃথিবী শীতল হইল এবং ক্রমে পৃথিবীতে জীবজন্তুর আবির্ভাব হইল। আবার সেই সূর্য্যেরই উত্তাপে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিতে লাগিল এবং সেই শস্য খাইয়া জীবগণ প্রাণধারণ করত উন্নতির পথে চলিতে লাগিল।

মনের উন্নতিসাধনও পালনীব্যবস্থার একটী অঙ্গ।

সহজ কথায় লালনপালনের অর্থে শরীর রক্ষার উপযোগী কর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকেই বুঝায়। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে মনেরও উন্নতিসাধন পালনকার্য্যের একটী অঙ্গ। ঈশ্বর আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যেমন নানাবিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের মনেরও উন্নতিসাধনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মনের উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানলাভ আবশ্যক। যাহাতে সেই জ্ঞান পাইতে পারি, ভগবান জগতের চারিদিকেই তাহার উপায় করিয়া রাখি-য়াছেন। তদ্ব্যতীত আমাদের অন্তরে জ্ঞানের একটা পিপাসা, সকল বিষয় জানিবার একটা ইচ্ছা দিয়াছেন। সেই জ্ঞানপিপাসার সাহায্যে ভগবানের রাজ্য হইতে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি, আপনাদিগের সুখশান্তি বর্দ্ধিত করিতে পারি এবং ক্রমে দেবত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

ঈশ্বর আমাদের কেবল শরীর ও মনের লালনপালনের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই। আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য এবং ভগবান তাঁহার নিজের পালনীব্যবস্থার পূর্ণতার সাধনের জন্য তিনি আমাদের আত্মারও উন্নতির উপায় বিধান করিয়াছেন। শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য আমাদিগকে বহির্জগতের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাদিগকে সেরূপ বাহিরের উপর নির্ভর করিতে হয় না। আত্মার শ্রেষ্ঠতম উন্নতিই হইল হৃদয়ে ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎলাভ। এক দিকে তিনি আমাদিগের আত্মাতে তাঁহার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎলাভ করিবার একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, অপর দিকে সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে দিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তিনি এমন কৌশলটী করিয়া রাখিয়াছেন যে আত্মার উন্নতির জন্য আমরা যতই বহির্জগত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিব, ততই তিনি আপনাকে ধরা দিতে থাকেন এবং ততই আমাদিগের সমস্ত জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহাকে লাভ করিলে আমাদিগের সকল উন্নতিরই সমাপ্তি হয়, আমাদিগের জীবন সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের অধিকারী হয়। তখন আমরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া জানিতে পারি, প্রাণের অন্তস্তল হইতে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দ ও শান্তি লাভ করি।

ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থাতে আত্মারও উন্নতি নিহিত আছে।

ঈশ্বরই আমাদিগের পিতা, তিনিই আমাদিগের মাতা। পিতৃত্ব

ঈশ্বর জগতের পিতা ও মাতা। ও মাতৃত্ব উভয়ই ঈশ্বরে এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে মিলিত হইয়া আছে। এই দুইটী ভাব ঈশ্বরের পিতৃভাবেরই এপিঠ ও ওপিঠ। যখন ঈশ্বরের পিতৃভাব এই জগত সংসারে নামিয়া আসিয়া তাহাকে এক অভিনব রসধারায় অভিষিক্ত করিতে চাহে, তখনই সেই পিতৃভাব দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পিতা ও মাতার মধ্য দিয়া দুই ভাগে অভিব্যক্ত হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় প্রভৃতি কার্য্যে যেমন তাঁহার পিতৃভাব সুব্যক্ত হয়, জগতের পালনকার্য্যে সেইরূপ তাঁহার পিতৃভাবের সঙ্গে মাতৃভাবও সুপ্রকাশিত হয়। একদিকে তিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, অপর দিকে তিনি আমাদিগের করুণাময়ী মাতা। তাঁহার পালনীভাব সংসারে প্রধানত মাতার হৃদয় এবং মাতার স্বজাতি স্ত্রীজাতির মধ্য দিয়াই অধিকতর পরিস্ফুট হইতে চাহে। ঈশ্বরের পালনীব্যবস্থার সহিত মাতৃত্বের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ইহলোকে সেই ব্যবস্থার তুলনা খুঁজিলে সর্ব্বাগ্রে মাতার কথাই মনে আসে।

নমস্কৃতি। যাঁহার প্রেম পিতা ও মাতাতে মূর্ত্তিমান হইয়া নিত্যই আমাদিগের নিকটে জীবন্তরূপে প্রকাশ পায়; যাঁহার প্রেমবিন্দু জগত চরাচরকে প্রেমের সুবাসে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে; যাঁহা হইতে এই বিশ্বজগত নিশ্বসিত হইয়াছে; যাঁহাতে এই অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; যিনি এই জগতসংসার সৃষ্টি করিয়া সুনিয়মে পালন করিতেছেন; যাঁহার ইঙ্গিতে প্রত্যেক অণুপরমাণু স্ব স্ব প্রয়োজনমত অর্থসকল লাভ করিতেছে; যাঁহার দয়া স্নেহ এই কঠোর সংসারকে কোমল করিয়া রাখিয়াছে; যিনি

প্রেমের সূত্রে আপনার সহিত জগতকে অভিন্ন হইয়া যাইবার অধিকার দিয়াছেন ; জগতের এত আনন্দ যাঁহার আকাশ-ঘন আনন্দের ছায়ামাত্র ; যিনি আমদিগের দয়াময় পিতা ও করুণাময়ী মাতা, এস আমরা তাঁহাকে ভক্তি ভরে নমস্কার করি ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা
নোঽসি গ্রন্থে ঈশ্বরের পালনীব্যবস্থা বিষয়ক
তৃতীয় ভাব সমাপ্ত ।

—ঃওঁঃ—

চতুর্থ ভাব—ঈশ্বর জ্ঞানদাতা ও পিতা।

ঈশ্বর আমাদিগের জ্ঞানদাতা ও পিতা। তিনি যেমন বিশ্বজগতের স্রষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা, তিনি যেমন জগত-সংসারের পালনকর্ত্তা বলিয়া আমাদিগের পিতা, সেইরূপ তিনি জ্ঞানদাতা গুরু বলিয়াও আমাদিগের পিতা। ক্ষুধা তৃষ্ণা পাইলে শিশুসন্তান পিতামাতার নিকট ছুটিয়া যায় এবং উপযুক্ত আহার ও পানীয় লাভ করিয়া তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইলে তাহার ছোটখাটো ভালবাসা পিতামাতার প্রতি উছলিয়া উঠে। সেইরূপ ভগবানও যদি এই জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহার লালন পালন মাত্র ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন, জগতের জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল মাত্র জগতের আহার বিহারের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলে জগতেরও ছোটখাটো ভালবাসা তাঁহার চরণে অর্পিত হইত। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সন্তান বলিয়া আমাদিগের গৌরব করিবার কিছুই থাকিত না। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টির সঙ্গে যেমন তাহার লালনপালনের আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ তিনি জগতের জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া জগতের জ্ঞানলাভেরও সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আপনার জ্ঞানের কণামাত্র জগতে ঢালিয়া দিয়াছেন, আর তাহারই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ পাইয়া আমরা তাঁহার মহিমা আলোচনা করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই এবং আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া জানিতে পারিয়া গৌরব অনুভব করি; তাঁহাকে জ্ঞানদাতা গুরু ও পিতা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে শতবার প্রণিপাত করি।

ঈশ্বর জগতের জ্ঞানদাতা।

ঈশ্বরের প্রেম একদিকে যেমন জগতপাতার মধুময় মূর্ত্তিতে জগত-সংসারে নামিয়া আসিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাহা জগতের জ্ঞানদাতা গুরুর জ্ঞানোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশ। যেদিকেই চক্ষু ফিরাই, সেইদিকে তাঁহারই জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাই। কর্ণ দ্বারা যাহা কিছু শ্রবণ করি, সেতো তাঁহারই কথা শুনিতে পাই। হৃদয়প্রাণ ব্যাপিয়া যত কিছু ভাবনা উপস্থিত হয়, আমাদিগের জ্ঞানে আমরা যে কোন নূতন তত্ত্ব লাভ করি, জগতের বাহিরে দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ নীরব ধ্যানে ভাবিয়া দেখিলে জানিতে পারি যে সেই সকল ভাবনা তত্ত্ব আমার প্রাণারামেরই প্রেমপূর্ণ উপদেশ।

আমাদের ভাবনা ঈশ্বরেরই উপদেশ।

জগতপাতার পালনী ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান পরিচয় যেমন আমাদের জন্মদাতা পিতার পালনকার্য্যে দেখিতে পাই, সেইরূপ সেই জগতগুরুর শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব্ব-প্রধান পরিচয় পাই আমাদিগের জন্মদাতা পিতার শিক্ষাদানকার্য্যে। জন্মদাতা পিতা সন্তানের লালনপালনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অল্পে অল্পে জ্ঞান শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিরূপে চলাফেরা করিতে হয়, কিরূপে বিপদ আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, এই প্রকার নানা বিষয়ে জন্ম-দাতা পিতা শৈশবাবধিই সন্তানকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভগবান জগতে তাঁহার যে জগতগুরুর ভাব ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, সেই ভাবেরই ফলে ইহলোকে জন্মদাতা পিতা সন্তানের শিক্ষাদানকে স্বভাবতই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন।

পিতার শিক্ষাদানকার্য্যে ঈশ্বরের শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান পরিচয়।

সন্তানকে নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতার কেবল কর্ত্তব্য নহে, পিতার পক্ষে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য। সন্তানের জন্মগ্রহণের সঙ্গে পিতার হৃদয় যেমন তাহার লালনপালনের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হয়, সেইরূপ তাহার শিক্ষাদানের জন্যও স্বতই উৎসুক হইয়া উঠে। সে বিষয়ে পিতাকে কাহারও পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক হয় না। বলিতে কি, সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া সন্তানপালনেরই একটা অঙ্গ। এই কারণে যদি কোন পিতার সন্তানগণকে অশিক্ষিত ও মূঢ় হইয়া থাকিতে দেখি, তাহা হইলে আমরা সহজেই বলিয়া উঠি যে সন্তানদিগকে উপযুক্তরূপ মানুষ করা হয় নাই, অর্থাৎ তাহাদিগকে যে ভাবে লালনপালন করা উচিত ছিল, সে ভাবে তাহাদিগকে লালন-পালন করা হয় নাই। আর, যদি কোন পিতার সন্তানদিগকে শিক্ষিত ও জ্ঞানেতে উজ্জ্বল দেখি, তাহা হইলে কেমন আনন্দের সহিত বলি যে সেই পিতা সন্তানদিগকে যেভাবে লালনপালন করা উচিত তাহাই করিয়াছেন। সেই পিতার প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কেমন সহজে ধাবিত হয়। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে কত না সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি।

সন্তানের শিক্ষাদান পিতার স্বাভাবিক কার্য্য।

সন্তানকে শিক্ষাদান করা পিতার পক্ষে এতদূর স্বাভাবিক যে আমরা সময়ে সময়ে কেবলমাত্র জ্ঞানদাতা গুরু-কেও পিতার আসনে বসাইতে কুণ্ঠিত হই না। ঘটনাচক্রে অনেক সময়ে জন্মদাতা পিতা নানা কারণে আপনার সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে অক্ষম হইয়া তাহার ভার

জ্ঞানদাতাও পিতার আসন অধিকার করেন।

কোন আত্মীয় বা বন্ধুর উপর দিতে বাধ্য হয়েন। সেই আত্মীয় বা বন্ধু যদি সেই শিক্ষাদানকার্য্য উপযুক্তরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সন্তানদিগের যে ভক্তিশ্রদ্ধা পিতার চরণে গিয়া পড়িত, তাহা সেই জ্ঞানদাতা গুরুর চরণে গিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই গুরুরও স্নেহপ্রেম সন্তানগণের উপরে নামিয়া আসিয়া চুম্বকের ন্যায় তাহাদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সন্তানকে শিক্ষাদান সর্ব্বজীবে দেখা যায়।

ভগবান তাঁহার জগতগুরুর ভাব সমগ্র জগতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই সন্তানকে শিক্ষা দিবার ভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক জগতবাসীর অন্তরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই কারণে এই ভাবটী মনুষ্যমাত্রে আবদ্ধ নহে। এই ভাব মনুষ্য অবধি ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরে জাগরূক দৃষ্ট হয়। প্রাণীমাত্রই নিজ নিজ সন্তানদিগকে তাহাদিগের জন্মাবধি বাসা প্রস্তুত করা, আহার সংগ্রহ করা, বিপদ আপদ হইতে আত্মরক্ষা করা প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে। প্রত্যেক প্রাণী আপনার অর্জ্জিত জ্ঞান সন্তানদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রদান করে বলিয়াই জগত ক্রমাগত উন্নতির পথে চলিতে পারিয়াছে।

জগতে জ্ঞানের বিষয় ছড়ানো।

সন্তানকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে চাহিলে পিতার জ্ঞান অর্জ্জন করা আবশ্যক। তাই জ্ঞানময় জগতগুরু পরমেশ্বর প্রকৃতিতে জ্ঞানের রাশি রাশি বিষয় ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ঈশ্বর যেমন জগতবাসী প্রত্যেকের অন্তরে জ্ঞানবীজ নিহিত করিয়া দিয়া-

ছেন, তেমনি তিনি সেই বীজের উন্নতিসাধনার্থ আমাদিগের চতুর্দ্দিকেই জ্ঞানের বিষয় সকল সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

জ্ঞানলাভ অতি স্বাভাবিক।

ঈশ্বর আমাদিগের জ্ঞান শিক্ষা দিবার এমন আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে আমরা যেমন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নিশ্বাসপ্রশ্বাস অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করি, জানিতেও পারি না যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস লইতেছি, সেইরূপ ইচ্ছা করি বা না করি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত জ্ঞানের বিষয়সকল হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদিগের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বীজকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকি—প্রতি মুহূর্ত্তেই জ্ঞানলাভ না করিয়া উপায় নাই। ভগবানের কি আশ্চর্য্য দয়া যে আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতর অধিবাসী, কিন্তু সেই অতি ক্ষুদ্র আমাদিগের জন্য কোথায় চক্ষুর অগোচর মনের অগোচর অণুপরমাণু, আর কোথায় অতলস্পর্শ গভীর গগনপ্রাঙ্গণের অন্তরে কোটী কোটী যোজন দূরে অবস্থিত কোটী কোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকা, এই সকলই তিনি আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল এমনই আশ্চর্য্য যে আমরা যদি কেবল একটীমাত্র পরমাণু লইয়াই আলোচনা করিতে থাকি, তাহা হইলে শত জন্মেও আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়ের অভাব ঘটিবে না। সেই একটী পরমাণু হইতেই আমরা নিত্যই নূতন নূতন তত্ত্ব পাইতে থাকিব। জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে, এই সুবিশাল আকাশের প্রত্যেক বিন্দুতে সেই অনন্ত পুরুষ স্বীয় অনন্ত ভাব অঙ্কিত রাখিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানময় পিতার রাজ্যে জ্ঞানের বিষয়ের কখনই অভাব ঘটিবে না।

ঈশ্বর বিশ্বজগতে জ্ঞানের বিষয় সকল ছড়াইয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে

জ্ঞান কি ?

জগতবাসীগণের অন্তরে জ্ঞানও মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই জ্ঞান একটী আশ্চর্য্য বস্তু। ইহা যে সত্য সত্য কি পদার্থ তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারি যে এই জ্ঞান আমাদিগের অন্তরে না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। আরও দেখি এই যে, এই জ্ঞান আমাদিগের অন্তরে থাকাতে আমরা যতই কেন নূতন কথা নূতন বিষয় জানি, ততই আরো নূতন নূতন বিষয় আমাদিগের বেশী করিয়া জানিবার ইচ্ছা হয় এবং এই জ্ঞান থাকাতেই আমরা নূতন বিষয় জানিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই অনন্ত-জ্ঞান পরমেশ্বর আপনার অসীম জ্ঞানের এক এক বিন্দু আমাদিগের অন্তরে রাখিয়াছেন বলিয়াই আমরা যতই কেন নূতন নূতন বিষয়ের তত্ত্ব লাভ করি, একটীর পর একটী করিয়া যতই কেন জ্ঞানলাভ করি, আমাদিগের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, ক্রমাগতই অধিকতর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা আসে এবং ক্রমাগতই অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারি। এই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার এবং জ্ঞানলাভের অধিকারের সীমার অভাব সেই অনন্তজ্ঞান অনন্তপুরুষেরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।

ঈশ্বরের দয়ার বিষয় ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পিপাসা

জ্ঞানেতে ঈশ্বরের দয়ার পরিচয়।

দিয়াছেন, তাহার শান্তির জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই জলের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষুধা দিয়াছেন, তাহার শান্তির জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই আহারের উপকরণ সমূহ প্রস্তুত রাখিয়াছেন। সেইরূপ তিনি জ্ঞান দিয়াছেন, সকল বিষয়

জানিবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন, আর তাহার শান্তির জন্য পূর্ব্ব হইতেই তিনি জগতে জ্ঞানের বিষয় সকল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি আমাদের অন্তরে জ্ঞানলাভের অধিকার প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয় দূরে থাক্, আমরা পিতামাতার প্রদত্ত উপদেশই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতাম না, সুতরাং বিপদ আপদ হইতেও আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইতাম। এরূপ অবস্থায় জগতসংসারে দাঁড়াইয়া থাকিবার আশা কোথায় থাকিত? ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানলাভের অধিকার দিয়াছেন বলিয়া আমরা অপরের জ্ঞানকে নিজস্ব করিয়া লইতে পারি এবং তাহারই ফলে একদিকে আমরা পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদিগের আচার ব্যবহার বুঝিতে পারি, অপরদিকে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ছন্দে ছন্দে পরিভ্রমণ প্রভৃতি নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সকলও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সর্ব্বোপরি, এই জ্ঞানের অধিকার লাভ করাতেই আমরা জ্ঞানদাতা পিতা পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে বিভোর হইয়া পড়ি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা
নোঽসি গ্রন্থে ঈশ্বর জ্ঞানদাতা ও পিতা বিষয়ক
চতুর্থ ভাব সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

পঞ্চম ভাব—ঈশ্বরের শিক্ষাব্যবস্থা।

ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা আলোচনা করিবার কালে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে তাহার মধ্যে অপচয়ের এতটুকুও স্থান নাই। আমাদের ছোটখাটো সংসারে লাভ আছে লোকসান আছে, কিন্তু বিরাট পুরুষের বিরাট সংসারে লোকসান নাই, একটী শক্তিরও বিনাশ নাই। ভগবান আমাদিগের জ্ঞানলাভের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহারও মধ্যে দেখিতে পাই যে অপচয়ের এতটুকু স্থান নাই। তিনি আমাদিগের শরীরে ক্ষুধাবৃত্তি দিলেন। ক্ষুধা তো অতি সামান্য চেষ্টা দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে জ্ঞান মহাব্যোম ভেদ করিয়া জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আবিষ্কারের স্পর্দ্ধা করে, সেই জ্ঞানস্পৃহারও অভিব্যক্তিমূল নিহিত করিয়া দিলেন সেই শারীরিক ক্ষুধাবৃত্তিতে। ক্ষুধা চরিতার্থ করিতে গিয়া জীবজন্তুকে জ্ঞানের অভিব্যক্তি বা উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ক্ষুধা ও জ্ঞানের মধ্যে এই যোগের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ে নির্বাক হইতে হয়।

ক্ষুধাবৃত্তিতে জ্ঞানস্পৃহার মূল নিহিত।

জ্ঞান ব্যতীত ক্ষুধার নিবৃত্তি করা অসম্ভব এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি না হইলে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিসাধন অসম্ভব। আমাকে জানিতে হইবে যে আমার আহার কোথায় আছে এবং কি উপায়ে সেই আহার সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয় জানিতে পারিলে এবং তদনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে পারিলে তবে আমরা আমাদের ক্ষুধা

ক্ষুধা ও জ্ঞানের মধ্যে আশ্চর্য্য যোগ।

দূর করিতে পারি। কিন্তু উপযুক্ত আহার সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষুধাশান্তি করিতে না পারিলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে, জ্ঞানের প্রধান যন্ত্র মস্তিষ্ক বিকল হইয়া পড়ে, কাজেই জ্ঞানও স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং আহার সংগ্রহ করিতে গেলেই জ্ঞানের উন্নতি হওয়া চাই। তার পর, ভগবানের সংসারে তুমি আমি দু একটী প্রাণী মাত্র আহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই নাই, কোটী কোটী জীব জন্তু কীট পতঙ্গ দেব যক্ষ মনুষ্য আপনাপন আহার অন্বেষণে ব্যস্ত। সেই কারণে আহার সংগ্রহে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। বলিতে গেলে, প্রত্যেক প্রাণী অপর প্রাণীগণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজের মুখে ফেলিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে প্রত্যেক প্রাণীকে অপর প্রাণীগণ অপেক্ষা আহার সংগ্রহের উন্নততর উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে হয়। যে যত উন্নত উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহার পক্ষে ভাল ভাল আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া তত সহজ হইবে। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে যত জ্ঞান সঞ্চয় করিবে তাহার পক্ষে আহার সংগ্রহের উন্নত উপায় আবিষ্কারও তত সহজ হইয়া পড়ে।

ক্ষুধাবৃত্তি হইতেই নানা বিদ্যার উৎপত্তি।

এইরূপে আমরা জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের সাময়িক ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে থাকি বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আমরা আমাদের প্রয়োজনমত আহার সংগ্রহ করিতে পারি না। তখন জ্ঞান আসিয়া পরামর্শ দেয় যে সময় থাকিতে অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সময়ে সেই

আহার্য্যসামগ্রী দ্বারা কেবলমাত্র সাময়িক ক্ষুধা দূর না করিয়া ভবিষ্যতের ক্ষুধা দূর করিবার জন্য খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত রাখা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তা আসিল যে বাসগৃহ কি প্রকার নির্ম্মাণ করিলে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য নিরাপদে রাখা যাইতে পারে। কাজেই তখন গৃহনির্ম্মাণসংক্রান্ত স্থপতি বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইল।

এইরূপে যখন সুলভ ও যথেষ্ট ভোজ্যদ্রব্য লাভ করাতে নগরে গ্রামে দেশে লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন আবার সময়ে সময়ে আহারের অকুলান হয় এবং কাজেই তখন জনপদবাসীগণ দলে দলে দূরদূরান্তরে দেশবিদেশে চলিয়া যায়। যখন দূরদেশে পরিভ্রমণ করিবার প্রয়োজন আসিল, তখন ক্রমে ক্রমে বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় জাহাজ, ব্যোমযান প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহনের আবিষ্কার হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে আবার জ্ঞানের কত না উন্নতি সাধিত হইল।

ক্ষুধা হইতেই জ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি।

আরও দেখি যে শরীর সুস্থ না থাকিলে আহার সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয় না। শীতের সময় দারুণ শীত হইতে এবং গ্রীষ্মের সময় প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপ হইতে কোন প্রকার আচ্ছাদনের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিলে দেখা যায় যে শরীর ভাল থাকে। তখন এই প্রয়োজন হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা আবশ্যক বোধ হইল। ক্রমে সেই বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য কত কলকারখানা স্থাপিত হইল। এইরূপে আহারসংগ্রহ, বস্ত্রসংগ্রহ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি এক একটী প্রয়োজনীয় বিষয় নিপুণরূপে

সম্পাদিত করিবার জন্য জ্ঞানের যে কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হয়, বিস্ময় প্রকাশ করিতে গিয়া বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়, কেবল নির্ব্বাক হইয়া মৌন অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমাতে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা হয়।

ক্ষুধাবৃত্তি ধর্ম্মপথে লইয়া যায়।

ক্ষুধা তো একটী অতি সামান্য বৃত্তি। এই ক্ষুধা যে কি প্রকারে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধনে প্রেরণ করে তাহা আমরা উপরে দেখিয়া আসিলাম। সেইটুকু মাত্র করিয়াই ক্ষুধা ক্ষান্ত নহে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ক্ষুধাই আবার আমাদিগকে ভগবৎপথেরও পথিক করিবার অধিকার রাখে। সময়ে সময়ে যখন আমরা আমাদিগের অভিলষিত মত আহার সংগ্রহে অক্ষম হই, প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে পরাজিত হই, তখনই আমাদের হৃদয়ে বড়ই অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমাদিগের অন্তরে সংসারের অসারতা বড়ই নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে থাকে। যখন দৈবদুর্বিপাকে আহারের অভাব ঘটিবার কারণে পুত্রকন্যাদিগের মুখে অন্ন দিতে অক্ষম হই এবং শীর্ণকায় কঙ্কালসার সন্তানেরা এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তখন আমরা কি প্রকার উপলব্ধি করি যে এই সংসারই আমাদিগের সর্ব্বস্ব নহে। তখন আমাদিগের দৃষ্টি সংসারের অতীত ও জগতনিয়ন্তা সেই অদৃষ্ট দেবদেব নিত্য পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। তখন যে অশান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই অশান্তিই পরিণামে উন্নত আকার ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভগবৎপথের পথিক করিয়া দেয়।

ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী কি আশ্চর্য্য ! কোথায় আমাদিগের ক্ষুধা-বৃত্তি ও ভোজনস্পৃহা এবং কোথায় সেই আশ্চর্য্য শান্তিপ্রদ অধ্যাত্ম-জ্ঞান, আর কোথায় সেই বিরাট পুরুষ ভগবান ? কিন্তু ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কি আশ্চর্য্য সংযোগ ! ক্ষুধা কেবল ক্ষুধামূর্ত্তিতে নিবৃত্ত হইয়াই ক্ষান্ত হইল না, কিন্তু সূর্য্যচন্দ্র যাঁহার মুকুটমণি, অনন্ত আকাশ যাঁহার সিংহাসন, সেই পরমদেবতার চরণতলে পর্য্যন্ত আমাদিগকে লইয়া চলিল, তাঁহার চরণস্পর্শ করিবার অধিকার দিল।

এস, আমরা সেই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরকে, সেই জ্ঞানদাতা পিতাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পূজা করিতে থাকি এবং সমবেত কণ্ঠে গগনভেদীস্বরে বেদমন্ত্রে তাঁহাকে ডাকিয়া বলি—

নমস্কৃতি।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও। নমস্তেঽস্তু—তোমাকে নমস্কার।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা নোঽসি গ্রন্থে ঈশ্বরের শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ক পঞ্চম ভাব সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

ষষ্ঠ ভাব—ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা ও পিতা।

ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা ও পিতা। তিনি আমাদের স্রষ্টা ও পিতা। তিনি আমাদের পাতা ও পিতা। আবার তিনি আমাদিগের প্রলয়কর্ত্তা ও পিতা। সৃষ্টিকার্য্যে যেমন সেই জগতপিতারই বিমল প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, জগতপালনে যেমন তাঁহারই স্নেহমাখা মাতৃভাব প্রকাশ পায়, তেমনি প্রলয়ের মধ্যে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ভীত হইলেও তাহার মধ্যে আবার তাঁহারই মঙ্গলময় পিতৃভাব সুন্দররূপে বিকশিত হয়। কথাটা শুনিলে খুবই আশ্চর্য্য হইতে হয় বটে যে, যিনি প্রলয়কর্ত্তা, জগতে যিনি ভীষণ প্রলয়কে প্রেরণ করিয়া আমাদিগের মস্তকের উপরে ভয়ের একটা বিকটকরাল ছায়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে আবার পিতা বলিয়া হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কথাটা মিথ্যা নহে। যে দেবাধিদেব আদিদেব এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত নিশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছে, প্রলয়ের বিকট প্রচণ্ড নৃত্যের উপরেও যে তাঁহারই মঙ্গলহস্ত বিস্তৃত দেখা যায়, একথা খুবই সত্য।

ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা ও পিতা।

প্রলয়ের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে লীন হওয়া বা মিশিয়া যাওয়া। সেই অর্থে কোন বস্তু বা শক্তি আপনার অস্তিত্ব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইলেই তাহাকে প্রকৃত প্রলয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রলয়সাধন আমাদিগের কল্পনার অতীত। যে সকল ঘটনা আমাদিগের চক্ষে

প্রলয় কাহাকে বলি?

সহসা আবির্ভূত হইয়া একটা দেশব্যাপী ও কালব্যাপী মৃত্যু, ধ্বংস বা বিনাশ আনয়ন করে, আমরা সচরাচর সেই সকল ঘটনাকেই প্রলয় বলিয়া অভিহিত করি। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। চারিদিক হইতে গাছপালা উপড়িয়া পড়িতে লাগিল, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকল চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। এইরূপ ঝড়কে আমরা প্রলয় ঝড় বলিব। প্লেগের মত একটা রোগ সহসা দেখা দিল। শত-সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পড়িতে লাগিল, চিকিৎসার সকল ব্যবস্থাই বিফল হইতে লাগিল। ইহাকে আমরা প্রলয় বলিয়া উল্লেখ করিব। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে যখন শত শত গ্রামপল্লীর শত লক্ষ অধি-বাসী অনাহারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; সহসা বন্যা আসিয়া যখন কতশত নগর গ্রাম হইতে কতশত পশু মনুষ্য প্রভৃতি জীবজন্তুকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন সেই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিকে, সেই বন্যাকে আমরা প্রলয় ঘটনা বলিয়া মনে করি। এই সকল ঘটনাতেই আমরা মৃত্যুর ভয়ে মুহ্যমান হইয়া প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বরের চরণতলে আছ-ড়াইয়া পড়ি এবং কাতরপ্রাণে তাঁহাকে স্বীয় রুদ্রমূর্ত্তি সংহরণ করিয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকি।

প্রলয় ঘটনাতে যখন আমরা ভয় পাই তখন আমরা একথা ভাবিয়া দেখি না যে, জগতে হঠাৎ কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না এবং জগতে মৃত্যু, ধ্বংস বা বিনাশ বলিয়া সত্য সত্য কোন কিছুই নাই। হঠাৎ হওয়ার অর্থ বিনা কারণে সংঘটিত হওয়া। জগতের কোন ঘটনাই কি বিনা কারণে সংঘটিত হইতে পারে? আমরা কোন ঘটনার কারণ জানিতে না পারিলে

প্রলয়ঘটনা হঠাৎ হইতে পারে না।

অথবা সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুত না থাকিলেই যে তাহা বিনা কারণে ঘটিল এমন কথা বলিতে পারি না। জগতের প্রত্যেক ঘটনাই কার্য্য-কারণশৃঙ্খলে বাঁধা। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনেক সময়ে অনেক ঘটনার কারণ প্রতিভাত না হইলেও ইহা একেবারে ধ্রুবসত্য যে একটী ঘটনাও সহসা বা বিনা কারণে ঘটিতে পারে না। সামান্য নিশ্বাসপ্রশ্বাস অবধি অনন্ত কোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের উদয়াস্ত পর্য্যন্ত একটী ঘটনাও আকস্মিক নহে। প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাশৃঙ্খলার সমবেত কার্য্যফল। জগতের প্রত্যেক ঘটনা এরূপ ভাবে কার্য্যকারণশৃঙ্খলাতে বাঁধা না থাকিলে বিজ্ঞানের ভিত্তিই দাঁড়াইতে পারিত না। কোন ঘটনা কার্য্যকারণের শৃঙ্খলবন্ধনের অতীত হইতে গেলে তাহার অতিপ্রাকৃতিক বা প্রকৃতির অতীত হওয়া আবশ্যক। এরূপ ঘটনা যদি বা সম্ভব হয়, তবু আমরা তাহা আমাদিগের কল্পনাতে উপলব্ধি করিতে পারি না। যে সকল ঘটনা আমাদিগের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহা প্রলয়ঘটনাই হউক অথবা অতি সামান্য ঘটনাই হউক, সেগুলিকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং কার্য্যকারণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইতেই হইবে। সুতরাং সত্য সত্য দেখিতে গেলে প্রলয়ঘটনা হঠাৎ হইল বলিয়া আমাদিগের আতঙ্কিত হইবার কোনই কারণ নাই।

একটী দৃষ্টান্ত দিই। একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল, আর তাহারই দৃষ্টান্ত। ফলে গাছপালা বাড়ীঘর বিস্তর পড়িয়া গেল। আমাদিগের মনে হইল যে হঠাৎ একি ঝড় উঠিল এবং একি ভীষণ কাণ্ড ঘটিল।

কিন্তু বাস্তবিক কি সেই ঝড় হঠাৎ উঠিয়াছিল এবং হঠাৎ কি সেই বাড়ীঘর গাছপালাগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছিল? তাহা হয় নাই। প্রথমে পৃথিবী গরম হইয়াছিল; তাহার ফলে পৃথিবী হইতে বাষ্প উঠিয়া মেঘ হইয়াছিল; সেই মেঘ বাড়িতে বাড়িতে সমুদয় আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল; ক্রমে মেঘের ফলে ঝড়বৃষ্টি হইল। এখানে দেখিতেছি যে ঝড়বৃষ্টির মূল কারণ পৃথিবীর গরম হওয়াতে গিয়া দাঁড়ায়। আবার যদি পৃথিবী কেন গরম হইল তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে যাই, তাহা হইলে হয়তো সূর্য্যের আভ্যন্তরীণ উত্তাপের আধিক্যে গিয়া পৌঁছিব। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিছাইয়া পিছাইয়া কারণ অন্বেষণ করিতে থাকিলে সম্ভবত কারণচক্রে গিয়া পৌঁছিব, কিন্তু এমন কথনই হইবে না যে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রাকৃতিক কারণ পাইব না। আবার বাড়ীঘরদুয়ার পড়িয়া গেল কেন, তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিব যে, এরূপ ভীষণ ঝড়ের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না; সুতরাং তাহা হইতে রক্ষার জন্য বাড়ীঘর যেরূপ দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করা উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। সেরূপ দৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ না করিবারও কারণ ছিল আমাদিগের বিদ্যা বা অর্থের অভাব। এইরূপে পিছাইয়া পিছাইয়া অনেক দুর যাইতে পারি, কিন্তু প্রথম অবধি কারণগুলি সম্পূর্ণরূপে জানা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। তাই বলিয়া ইহা স্বীকার করিতে পারিব না যে বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হওয়া একটী সুদীর্ঘ কারণশৃঙ্খলার ফল নহে।

জগতে যেমন হঠাৎ হওয়া বলিয়া কোন কিছু নাই, সেইরূপ

জগতে বিনাশ বা মৃত্যু নাই।

প্রকৃতপক্ষে জগতে মৃত্যু, ধ্বংস বা বিনাশ বলিয়াও কোন কিছু নাই। কোন ঘটনা হঠাৎ অর্থাৎ বিনা কারণে সংঘটিত হইতে পারিলে যেমন বিজ্ঞানের ভিত্তি দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ জগতে একটীও পরমাণু বা একটীও শক্তিকণার মৃত্যু, ধ্বংস বা বিনাশ সম্ভবপর হইলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ, কারণ তাহা হইলে জগতের পরমাণুসমষ্টি বা শক্তিসমষ্টির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারিত না। বিজ্ঞান পরমাণু বা শক্তির পরিমাণ স্থিরনির্দ্দিষ্ট ধরিয়া লইয়া তবে তদ্বিষয়ক নিয়ম আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই এই যে জগতে যত কিছু পরমাণু বা শক্তি আছে, তাহাদিগের সকলেরই রূপান্তরিত হইবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহাদিগের অংশমাত্রেরও বিনষ্ট হইবার অধিকার নাই। জল হইতে বরফ হইতে পারে, বরফ হইতে বাষ্প হইতে পারে, কিন্তু সেই জলের একটীও পরমাণুর প্রকৃত প্রলয় বা বিনাশ ঘটিতে পারে না। বাষ্পশক্তি তাড়িত শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু সেই উভয়শক্তির কোনটীরই একটী বিন্দুও বিনষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং আমরা দৃঢ়তার সহিত ইহা বলিতে পারি যে প্রলয়ঘটনারও ফলে জগতে সত্য সত্য কোনপ্রকার মৃত্যু বা বিনাশ আসিতে পারে না।

প্রলয় ঘটনার নিয়ন্তা কে?

এখন, প্রলয়ঘটনা সকল কে নিয়মিত করিতেছেন? কাহার আদেশে এই সকল ঘটনা জগতসংসারে প্রেরিত হইতেছে? জগতের প্রত্যেক ঘটনা সুতরাং প্রলয় ঘটনাও কার্য্যকারণশৃঙ্খলায় আবদ্ধ এবং জগতে কোন ঘটনার

ফলে, এমন কি প্রলয়ঘটনারও ফলে, কোন কিছুরই বিনাশ সম্ভবে না, এই দুইটী নিয়ম যিনি নিয়মিত করিতেছেন, তাঁহারই আদেশে যে প্রলয়ঘটনা সকলও নিয়মিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। উপরোক্ত নিয়ম দুইটীই বা কাহার আদেশে নিয়মিত হইতেছে? নিয়ম আপনা-আপনি আসিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ ইহার কোন প্রমাণ আবশ্যক নাই। নিয়ম থাকিলেই যে তাহার নিয়ন্তা চাই, সেই নিয়মকে চালাইবার যে একজন কর্ত্তা চাই, এই সত্যের বিপরীত আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। এখন নিয়ম দুইটীর কর্ত্তা কে, চালক কে? যে দুইটী নিয়মের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহারা যে সৃষ্টির ভিতরেই কার্য্য করিতেছে তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সৃষ্টির বাহিরে কি পদার্থ বা ঘটনা আছে যে তাহার উপরে এই নিয়মগুলি কার্য্য করিবে? সৃষ্টির বাহিরে বা সৃষ্টি না থাকিলে ইহারা কার্য্য করিবার অবসরই পাইত না, সুতরাং ইহাদিগের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যতদুর ধরিয়া সৃষ্টি রহিয়াছে এবং যতকাল ধরিয়া সৃষ্টি রহিয়াছে, ততদূর এবং ততকাল ধরিয়াই এই নিয়মগুলি কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যতকাল সৃষ্টি থাকিবে ততকালই এই নিয়মগুলিরও কার্য্যকারিতা বর্ত্তমান থাকিবে। যে নিয়মের ব্যাপ্তি সৃষ্টির আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সে নিয়মের নিয়ন্তা বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা ও পাতা স্বয়ং ভগবান ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এই নিয়মগুলির নিয়ন্তা যখন পরমেশ্বর, তখন সেই নিয়মগুলি দ্বারা নিয়মিত প্রলয়ঘটনা সমূহেরও নিয়ন্তা

যে পরমেশ্বর তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে ? কে অস্বীকার করিবে যে, যাঁহার আদেশে আমাদের প্রতি নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত হইতেছে, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকার উদয়াস্ত নিয়মিত হইতেছে, যাঁহার আদেশে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিস্থিতি নিয়মিত হইতেছে, তাঁহারই আদেশে প্রলয়ঘটনা সকলও জগতে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে ? তিনিই প্রলয়কর্ত্তা। আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস হোক, অথবা ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প বা বন্যা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রলয়ঘটনাই হোক, সকলই সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। একটী নিমেষও তাঁহার আদেশ অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না।

প্রলয়ে ঈশ্বরের পিতৃমূর্ত্তি।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর যখন প্রলয়কর্ত্তা, প্রলয়ঘটনা সকল যখন তাঁহারই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তখন তাঁহার মঙ্গল পিতৃভাব যে সেই সকল ঘটনার উপরেও বিস্তৃত হইবে তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। জগতস্রষ্টা বিশ্বপাতা পরমেশ্বর প্রলয়েরও অধীশ্বর বলিয়াই আমরা প্রলয়ঘটনা সমূহে একদিকে যেমন তাঁহার উদ্যতবজ্র রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হই, অপরদিকে তেমনি সেই প্রলয়েরই মধ্যে তাঁহার প্রসন্নবদন শান্ত পিতৃমূর্ত্তি আমাদিগের ত্রাসকম্পিত চিত্তকে শান্তি প্রদান করিতে থাকে। যে নিয়মে প্রলয় হইতে বিনাশ ও মৃত্যুর ছায়া বিদূরিত হইয়াছে, সেই নিয়মই কি প্রলয়ের মধ্যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের পিতৃভাব সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে না ? তিনি যেমন জগতের জন্মদাতা হইয়া, জগতকে সুনিয়মে পালন করিয়া আমাদের পিতৃপদে

অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেইরূপ প্রলয় হইতে মৃত্যু ও বিনাশের অধিকার কাড়িয়া লইয়াও তিনি আমাদিগের পিতার আসনে চির-অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সকল কালে, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎ পিতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের সকল ভয়, সকল দুঃখ, সকল শোকতাপ দূর হউক।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা নোঽসি গ্রন্থে ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা ও পিতা বিষয়ক ষষ্ঠ ভাব সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

সপ্তম ভাব—প্রলয়ে মঙ্গল।

প্রলয়েতে সৃষ্টিবীজ নিহিত।

ঈশ্বর যে প্রলয়কর্ত্তা ও পিতা এবং তিনি যে প্রলয় হইতে মৃত্যুর অধিকার কাড়িয়া লইয়া প্রলয়েরও মধ্যে তাঁহার মঙ্গলময় পিতৃভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিলাম। তাঁহার রাজ্যে সকলই বিচিত্র। তিনি যে প্রলয় হইতে মৃত্যু বা বিনাশের অধিকারমাত্র কাড়িয়া লইয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নহে, তিনি প্রলয়েরই মধ্যে সৃষ্টিবীজ নিহিত করিয়া রাখেন; আমরা যাহাকে মৃত্যু, ক্ষয় বা বিনাশ বলি, তাহারই মধ্যে তিনি প্রাণের বীজ, জ্ঞানের বীজ বপন করেন। আমাদের ক্ষুধা পাইলে একদিকে শরীরের ক্ষয় হয়, আহার পরিপাকেরও সময়ে শরীরের ক্ষয় হয়, কিন্তু সেই ক্ষয়েরই পরিবর্ত্তে আমরা শরীরে বল পাই, প্রাণ পাই এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যে প্রলয়ের নামে জগতবাসীগণ ভয়ে কম্পিত হয়, সেই প্রলয়েরই ভিতর সৃষ্টির সূত্র ওতপ্রোত ভাবে গাঁথা রহিয়াছে। পৃথিবী গরম হইল, ঝড়বৃষ্টি হইয়া গেল, পৃথিবী শীতল হইয়া হাসিতে লাগিল, বাতাস পরিষ্কার হইয়া গেল, পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি বর্দ্ধিত হইল এবং যথাকালে বসুন্ধরা ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বন্যা আসিল, দেশদেশান্তর জলে ডুবিয়া গেল, নূতন পলি পড়িল, জলমগ্ন দেশগুলি ধনধান্যে পূর্ণ হইবার উপযোগী হইয়া উঠিল। এই সকল ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গল হস্ত ব্যতীত আর কি দেখা যায়? ভাবিলে নির্ব্বাক হইতে হয় যে কি প্রকার বৃহৎ প্রলয়ব্যাপারের ফলে আজ আমরা

পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি লাভ করিয়া শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। আমরা আজ কোটী কোটী বৎসর পরে পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পাইব বলিয়া কত শতসহস্র বৃক্ষলতা, কত জীবজন্তুকে কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে ভীষণ বন্যা প্রভৃতি প্রলয় ব্যাপারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমরা প্রলয়েরও মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলমূর্ত্তি ও পিতৃভাব দেখিতে না পাই, তবে আমরা নিতান্তই অন্ধ।

সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখি বলিয়া প্রলয়ে ভয় পাই।

সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই যে, যখন পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তি মঙ্গলময় পরমেশ্বর বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পাতা এবং তিনিই যখন প্রলয়কর্ত্তা, তখন প্রলয়েতে মৃত্যু আসিল, বিনাশ আসিল বলিয়া আমাদিগের হাহুতাশ করিবার অবসরই নাই। ভুলিয়া যাইবার কারণ এই যে অনেক সময়ে আমরা দৃষ্টিকে বড়ই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া প্রলয়ঘটনাসমূহের প্রতি দৃষ্টি করি। প্রলয়ঘটনার ফলাফল ভগবানের সুবিশাল জগতচরাচরের স্বার্থের সহিত ওজন না করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সহিত ওজন করি। প্লেগরোগে আমার বাটীতে একটী আত্মীয়ের মৃত্যু হইল, আমার পার্শ্বের বাটীতে একটী মৃত্যু হইল, আমার গ্রামে কয়েকটী মৃত্যু ঘটিল। আমি স্থির জানিতেছি যে, যাহাদিগকে আমি মৃত বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাদিগের সত্যসত্য মৃত্যু হয় নাই, তাহারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এ সকল জানিলেও প্লেগের ভয়ে আমার

চিত্ত কাঁপিয়া উঠে, কারণ আমি নিজের স্বার্থের দিক দিয়াই প্লেগরোগকে দেখি এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বর যে প্রলয়েরও কেন্দ্রে অবস্থিতি করিতেছেন সে কথা ভুলিয়া যাই। আমি দেখি যে যাহারা আমার পরিচিত ছিল, আত্মীয়তা প্রভৃতি সূত্রে যাহাদিগের সঙ্গে আমার বিষয়ঘটিত স্বার্থ জড়িত ছিল, যাহাদিগের প্রতিবেশীত্ব বা গ্রামবাসীত্বের সঙ্গে আমার মনের সুখ অল্পবিস্তর জড়িত রাখিয়াছিলাম, তাহাদিগের সহিত আমার আর কথাবার্ত্তা হইবে না, দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। এই কারণে তাহাদিগের মৃত্যুতে আমার স্বার্থে আঘাত পড়িল। প্লেগরোগে এত শীঘ্র মৃত্যু হয় যে আমার স্বার্থকে নূতন অবস্থায় উইল প্রভৃতি যথাযথ উপায়ে বজায় রাখিবার বন্দোবস্ত করিবার অবসর পাই না, তাই প্লেগের নামে এত ভয় পাই। আবার সেই সঙ্গে ইহাও যে মনে আসে যে কোন্‌দিন অতর্কিতভাবে আমি নিজেও প্লেগে আক্রান্ত হইয়া আমার চিরসঞ্চিত স্বার্থসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইব, তাহা বলা বাহুল্য। এই অবস্থায় আমাদের নিজেদের স্বার্থ বুকের উপর এতটা চাপিয়া বসে যে তাহার ভারে বদ্ধনিশ্বাস হইয়া মৃত্যুর মধ্যে যিনি অমৃত সেই অমৃত পুরুষকে দেখিবার জন্য চক্ষু উঠাইবার ক্ষমতাও হারাইয়া ফেলি। তাই ভাবি যে প্লেগের ফলে জগতে ভয়ানক অমঙ্গল আসিল এবং তাই প্লেগের ভয়ে কম্পিতহৃদয়ে হাহুতাশ করিতে থাকি।

গগনস্পর্দ্ধী সৌধরাশি, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে থাকিলে আমরা তাহাকে উন্নতির চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করি। তাই,

যখন ভূমিকম্পে সেই সৌধপ্রাসাদ অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ হইয়া যায়, তখন আমরা মনে করি যে ভূমিকম্পের ফলে অমঙ্গল আসিল, কারণ আমরা আমাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করিয়া যে সকল কার্য্যকে উন্নতির চিহ্ন বলিয়া মনেতে বড়ই যত্নের সহিত পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম, ভূমিকম্প আমাদিগের সেই চিরপুষ্ট স্বার্থের প্রতি এতটুকু মনোযোগ প্রদান না করিয়া অনায়াসেই মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সকল অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বার্থকেও নিষ্ঠুরভাবে ধূলিসাৎ করে।

এই যে ইউরোপখণ্ডে প্রচণ্ড সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে; কত-শত লক্ষ লোক অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, কতশত গ্রন্থাগার, কতশত কলকারখানা কামানের গোলার মুখে ভস্মসাৎ হইয়া যাই-তেছে; কত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি উন্নতমনা ব্যক্তি মহাভ্রম মহামোহের ফলে এই সমরাগ্নিতে আহুতিস্বরূপে প্রদত্ত হইতেছেন। ইউরোপের পক্ষে আমরা এই ঘটনাকে ঘোর অমঙ্গল বলিয়া মনে করিতেছি, কারণ আমাদের মতে এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের গুরুতর স্বার্থহানি হইবে। আবার আমাদিগের পক্ষেও এই যুদ্ধকে অমঙ্গল বলিয়া ভাবিতেছি, কারণ ইহার ফলে আমাদিগেরও অনেক স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখি। এই যুদ্ধের ফলে আমাদিগের দেশের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি মহার্ঘ্য হইয়া পড়িতেছে এবং কাজেই আমাদিগের জীবনধারণের পথে বিঘ্ন আসিবার সম্ভাবনা হইতেছে; আমাদের দেশের কত সৈন্যকে এই যুদ্ধে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে; কত অর্থ ব্যয় করিতে

হইতেছে। সুমেরুবৃত্ত বা কুমেরুবৃত্তের কোন অংশে যদি যুদ্ধ হইত এবং তাহার ফলে যদি আমাদিগের দেশের স্বার্থে কোনপ্রকার আঘাত না লাগিত, তাহা হইলে সে যুদ্ধকে আমরা আমাদিগের পক্ষে অমঙ্গল বলিয়া ভাবিতাম না।

বিশ্বজগতের স্বার্থ দিয়া দেখিলে ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত প্রলয়ে সুস্পষ্ট দেখা যায়।

যত বড়ই প্রলয়ঘটনা হোক না কেন, আমরা যদি সেগুলি আমাদিগের স্বার্থের কাঠিতে না মাপিয়া, যে ভগবান বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়া সুনিয়মে রক্ষা ও পালন করিতেছেন, সেই ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডজগতের স্বার্থের কাঠিতে পরিমাপ করি, তাহা হইলে সেই সকল ঘটনাতে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের পরিচয় পাইতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। মনে কর যে একটা আমগাছে অনেকগুলি আম ফলিয়াছে। আমি নিজের জন্য এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের জন্য একদিন সেই আমগুলি সমস্তই পাড়িয়া লইলাম এবং আমরা সকলে সেইগুলি দ্বারা ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া জগতের উন্নতিসাধক কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। এখন, গাছটী যদি কেবল নিজের স্বার্থের দিক দিয়া এই ফল পাড়া ব্যাপারকে দেখে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বলিবে যে তাহার রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল আসিয়াছে, প্রলয় আসিয়াছে। কিন্তু সে যদি তাহার নিজের স্বার্থের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া বিশাল-তর মানবরাজ্যের স্বার্থের দিক দিয়া দেখিত তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার ফলগুলি পাড়িয়া লওয়াকে অমঙ্গল মনে করিবার পরিবর্ত্তে মঙ্গলজনকই বিবেচনা করিত। সেইরূপ উপরে যে ইউরোপীয় মহাসমরের কথা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে যে লক্ষ লক্ষ লোকের

মৃত্যু ঘটিতেছে, ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে, এই সকল ঘটনা স্থানবিশেষের বা কালবিশেষের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্য দিয়া দেখিলে আমাদের চক্ষে অমঙ্গল বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু যদি এই সকল ব্যাপার সেই জ্ঞানময় পরমপুরুষের জ্ঞানের দিক হইতে, সেই সর্ব্বমঙ্গল পরমেশ্বরের সমগ্র জগতসংসারের স্বার্থের দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে এই সত্যের উপর নিশ্চয়ই নির্ভর করিতে পারিব যে এই সংগ্রাম কখনই অমঙ্গলজনক হইতে পারে না, কারণ মঙ্গলময়ের আদেশে এই ঘটনা সমগ্র জগতের মঙ্গলের সহিত জড়িত। এই সংগ্রামের ফলে যে কিরূপ মঙ্গল সংসাধিত হইবে তাহা আমরা সম্পূর্ণ না জানিতে পারিলেও তাহার যে ইঙ্গিত পাই না, আভাস পাই না সে কথা বলিতে পারি না। আমাদিগের বিশ্বাস যে, যে সাংঘাতিক সামরিক ভাবের উপর এতদিন ধরিয়া সমস্ত ইউরোপ দাঁড়াইয়াছিল, সে ভাব আর বেশী দিন দাঁড়াইতে পারিবে না। এই দারুণ সংগ্রাম সেই ভাবের উষ্ণ বায়ুকে বিদূরিত করিয়া শীঘ্রই এক নবতর শান্তিময় বিমল বায়ুর স্রোত প্রবাহিত করিবে। এই সংগ্রামের ফলে জগতে ধর্ম্মরাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠা হইবে। লক্ষ কোটী লোকের আত্মবিসর্জ্জনের বিনিময়ে এই ধরাধামে ক্ষাত্রবলে ধিকৃত হইয়া ব্রহ্মতেজের বল এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অগত্যা মঙ্গলময় ভগবানের পিতৃভাবেরই জয়জয়কার হইবে। এইরূপে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রলয়ঘটনা হউক বা অন্য যে কোন ঘটনা হউক, প্রত্যেক ঘটনাতেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলহস্ত বিস্তৃত থাকে। ভগবান তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞানে ঠিক জানিতেছেন যে

কোন্ স্থানে এবং কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ ঘটনাটী ঘটিলে তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থেই তাঁহার মঙ্গলভাব অবিচলিত ভাবে নীরবে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

যে দেবাধিদেবের আদেশে জগত হইতে মৃত্যু পলায়ন করিয়াছে, প্রার্থনা। যিনি জগত হইতে অমঙ্গল দুর করিয়া স্বীয় অসীম করুণার পরিচয় দিয়াছেন, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কার্য্যে যাঁহার পিতৃভাব নিত্যনিয়ত সুব্যক্ত হইতেছে, এস, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা পরম পিতা বলিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখি এবং সর্ব্ব-প্রকার ভয়ভাবনা হইতে মুক্ত হই। তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া যদি কখনো প্রলয় ঘটনাতে আতঙ্কিত হই, তখন আকুল প্রাণে কাতর কণ্ঠে তাঁহারই চরণে আছড়াইয়া কাঁদিয়া বলিব—মা মা হিংসীঃ—হে দেব হে পিতা আমাকে বিনাশ করিও না, আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তখন নিশ্চয় আমার সেই দয়াল পিতার আসন টলিয়া যাইবে এবং তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কোলে লইয়া আমার সকল ব্যথা সকল ভয় দুর করিয়া দিবেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা

নোঽসি গ্রন্থে প্রলয়ে মঙ্গলবিকাশক

সপ্তম ভাব সমাপ্ত

—:ওঁ:—

অষ্টম ভাব—ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ ও পিতা।

ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ ও পিতা। তিনি যেমন এই জগতচরাচরের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা হইয়া জগতপিতার আসন অধিকার করিয়াছেন, তেমনি তিনি জগতের জ্ঞানদাতা গুরু হইয়াও আমাদিগের পিতৃপদে বরিত হইয়াছেন। আবার যে ধর্ম্ম জগতকে ধরিয়া রাখিয়াছে, রক্ষা করিতেছে, যে ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত জগতকে ক্রমাগত উন্নতিরই পথে অব্যাহতভাবে লইয়া চলিয়াছে, মঙ্গলময় পরমেশ্বর সেই ধর্ম্মকে জগতে প্রেরণ করিয়া তাঁহার পিতৃভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মের মধ্যে ভগবানের প্রশান্ত ও সুমঙ্গল পিতৃমূর্ত্তি স্পষ্টতম দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ ও পিতা।

ধর্ম্ম যে সত্যসত্য কি অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আমাদিগের পক্ষে জানিতে পারাও অসম্ভব এবং অপরকে তাহা বুঝানও অসম্ভব। কেবল ধর্ম্ম কেন, জগতে এমন অনেক বস্তু আছে যাহাদিগের স্বরূপ আজ পর্য্যন্ত আমরা কেহই জানিতে পারি নাই এবং কোন কালে কেহ জানিতে পারিবে বলিয়া আশাও করি না। তবে তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী ফলাফল প্রভৃতি অবলম্বনে তাহাদিগের স্বরূপের আভাসমাত্র আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এই যে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে একটী আকর্ষণী শক্তি কার্য্য করিতেছে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ আমরা কেহই জানিতে পারি না। তবে, আমাদিগের শরীরে মনে বাহিরের বস্তুকে এবং অন্তরের শক্তিসমূহকে

ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারি না।

আকর্ষণ করিবার যে একটী শক্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাই, তাহারই কার্য্যপ্রণালী ফলাফল প্রভৃতির সহিত গ্রহনক্ষত্রাদির কার্য্যকলাপ মিলাইয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আকর্ষণী শক্তির একটী সূক্ষ্মতম আভাসমাত্র পাই। এই যে বিশ্বচরাচরের এত বড় একটা সৃষ্টি হইয়াছে, এই সৃষ্টিতত্ত্বেরই বা স্বরূপ কে জানিতে পারে? তবে, আমাদিগের অন্তরে যে একটী ইচ্ছাশক্তি আছে, আমাদিগের বুদ্ধিতে জ্ঞানেতে যে একটী উদ্ভাবনী শক্তি আছে, সেই ইচ্ছাশক্তি উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনে আমরা সৃষ্টির মূলতত্ত্বের অতি নিগূঢ়তম একটী ইঙ্গিত লাভ করিতে পারি; ঈশ্বর যে ইচ্ছামাত্রে এই জগত সৃষ্টি করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারই ইচ্ছার পরিণতিতে যে এই সৃষ্টি ঘটিতে পারে, এই তত্ত্বটীর পরিধিমাত্র আমরা আমাদিগের জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি। সেইরূপ ধর্ম্মেরও প্রকৃত স্বরূপ আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদিগের আত্মাতে এমন একটী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি, যে শক্তি আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছে। এই শক্তির কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনে আমরা ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপের একটুখানি আভাস পাইয়া থাকি। সেই আভাসটুকু স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ধর্ম্মের বিষয় বুঝিতে গেলে তাহার লক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে বুঝিতে হইবে।

ধর্ম্মের যেটুকু আভাস আমাদিগের আত্মাতে উপলব্ধি করি, ধর্ম্ম সামঞ্জস্যশক্তি। তাহার সহিত জগতের কার্য্যপ্রণালী মিলাইয়া এইটুকু বুঝি যে ধর্ম্ম জগতের এমন এক শক্তি, যে শক্তির অভাবে

জগতের অস্তিত্বই থাকিত না এবং যে শক্তি থাকাতে এই শোভন-সুন্দর জগত বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের অন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আমরা উপলব্ধি করিব যে আমাদিগের অন্তর্নিহিত একটী শক্তি আমাদিগের প্রকৃতিকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিমেষে নিমেষে জাগ্রত ও পরিস্ফুট করিয়া দিয়া আমাদিগকে অভিব্যক্তি প্রভৃতি অন্যান্য শক্তির সাহায্যে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। এই শক্তিই আমাদিগের ইচ্ছাশক্তি জ্ঞান প্রেম প্রভৃতিকে যথানিয়মে পরিচালিত করিয়া উন্নতির অভিমুখীন করিয়া দিতেছে। এই শক্তি অবলম্বনে আমরা বুঝিতে পারি যে সমগ্র জগতচরাচরেও এমন এক শক্তি কার্য্য করিতেছে, যে শক্তি এই জগতের এবং এই জগতস্থিত প্রত্যেক অণুপরমাণুর প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করিয়া আকর্ষণীশক্তি অভিব্যক্তিশক্তি প্রভৃতি নানা শক্তির সাহায্যে জগতকে উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছে। এই শক্তিই ধর্ম্ম। ইহার অপর নাম সামঞ্জস্যশক্তি।

ধর্ম্মকে কেন সামঞ্জস্যশক্তি বলা হইল?

ধর্ম্মকে যে কেন সামঞ্জস্যশক্তি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহার কারণ এই যে বিনা সামঞ্জস্যে জগতের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, জগতের একটী পরমাণুরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে বিভিন্ন শক্তিসমূহ যে প্রতিমুহূর্ত্তে কার্য্য করিতেছে, সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। সেই বিভিন্ন শক্তিসমূহের কতকগুলি কেন্দ্রানুগ এবং কতকগুলি কেন্দ্রাতিগ। কেন্দ্রানুগ শক্তিসকল আপনাপন বিষয়গুলির প্রত্যেক অংশকে তাহাদিগের স্ব স্ব কেন্দ্রের অভিমুখে টানিতে চাহে এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি-

সকল আপনাপন বিষয়গুলির প্রত্যেক অংশকে তাহাদিগের স্ব স্ব কেন্দ্র হইতে ক্রমাগতই দূরে ফেলিতে চাহে। কেন্দ্রানুগ শক্তিসকল কার্য্যক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে সমগ্র জগত একটী সুবৃহৎ জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়া যাইত। কেন্দ্রাতিগ শক্তিসকল একাধিপত্য লাভ করিলে সমগ্র জগত সূক্ষ্মতম বাষ্পাকারে অদৃশ্য হইয়া থাকিত। আর যদি উভয়বিধ শক্তিসকল সমান বলে দ্বন্দক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে তাহার ফল যে কি হইত তাহা কে বলিতে পারে? এই উভয়বিধ শক্তিসমূহের মধ্যে ধর্ম্মই একমাত্র সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক এই জগতকে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং ইহাকে শোভন-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্যবিধায়ক মহাশক্তি, তাহার পরিচয় আমরা কি বহির্জ্জগতে কি অন্তর্জ্জগতে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই পাইয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই যে জগতের প্রত্যেক শক্তিই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে কার্য্য করিয়া থাকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের কার্য্যফল বিভিন্ন আকারে আমাদের নয়নসমক্ষে উপস্থিত হয়। এই যে একটী আকর্ষণী শক্তি আছে, ইহা জগতের সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে ও সকল অবস্থাতেই কার্য্য করে, কিন্তু কার্য্যফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করে। এই আকর্ষণশক্তির কার্য্যকারিতার পরিচয় বৃক্ষের ফলপতনেও পাওয়া যায়, আবার ইহারই কার্য্যফলে মহোচ্চ পর্ব্বতসমূহ হইতে কতশত নদনদী নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হয়। ইহারই কার্য্যকারিতায় সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রগণও স্বীয় স্বীয় কক্ষে যথানিয়মে অবিশ্রান্তে

ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-শক্তির পরিচয়।

পরিভ্রমণ করিতেছে ; ইহাই আবার প্রেমরূপে আত্মাতে অবতীর্ণ হইয়া* লোকলোকান্তরবাসী আত্মাদিগকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। শক্তিমাত্রই যখন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে কার্য্য করিয়া থাকে, তখন ধর্ম্মের সামঞ্জস্যশক্তিও এই নিয়মের ব্যতিরেকস্থল হইতে পারে না। এই বিশ্বজগত যে জড়পিণ্ডের আকার ধারণ না করিয়া অথবা বাষ্পাকারে চির অদৃশ্য না হইয়া এমন শোভনসুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে, ইহাই সেই সামঞ্জস্যশক্তির সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে কার্য্য করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। আবার যখন এই শক্তি কাম ক্রোধ প্রভৃতি শক্তিসমূহের উদ্দামবেগ প্রশমিত করিয়া তাহাদিগকে যথাযুক্ত কর্ম্মে বিনিযুক্ত করে, তখন ইহার কার্য্যকারিতার পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হই। কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে ধর্ম্ম প্রতিমুহূর্ত্তেই সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে, কিন্তু যখন ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতির ন্যায় কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনার পরে সামঞ্জস্যের ফলে ধরণী পুনরায় হাসিতে থাকে, অথবা যখন আমরা কাম ক্রোধকে মহাসংগ্রামে পরাজয় করিয়া আত্মাতে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া শান্তি লাভ করি, তখনই আমরা ধর্ম্মের কার্য্যকারিতার পরিচয় কিছু স্পষ্টতররূপে অনুভব করিতে পারি।

ধর্ম্ম কর্ত্তৃক উপযোগিতা বিধান।

ধর্ম্ম সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা জগতের প্রত্যেক পদার্থকে এবং প্রত্যেক পদার্থের অণুপরমাণুকে প্রতিমুহূর্ত্তে সাময়িক অবস্থার উপযোগী করিয়া লয়। জলে অগ্নিসংযোগ করা হইলেও যদি তাহা বাষ্পে পরিণত না হইত, তবে তাহা সাময়িক অবস্থার উপযোগী হইত না। ধর্ম্ম অগ্নিসংযুক্ত জলে

কেন্দ্রাতিগ শক্তিকে অধিকতর পরিমাণে কার্য্য করিতে দিয়া সেই জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া তাহাকে সাময়িক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিল। আবার যখন সেই বাষ্পে যথাপরিমাণে শৈত্য প্রয়োগ করা হইবে, তখন ধর্ম্মই তাহাকে বরফে পরিণত করিয়া সাময়িক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিবে। এইরূপে ধর্ম্ম সামঞ্জস্য বিধানের ফলে সমগ্র জগতে, জগতের প্রত্যেক পদার্থে এবং প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে প্রতিমুহূর্ত্তের সাময়িক অবস্থার উপযোগিতা আনয়ন করিতেছে বলিয়াই এই জগত বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

ধর্ম্ম জগতের উন্নতির মূল।

ধর্ম্মই জগতের উন্নতির মূল। ধর্ম্ম যখনই কোন পদার্থে বা কোন অণুপরমাণুতে কোন মুহূর্ত্তের সাময়িক অবস্থার উপযোগিতা আনয়ন করে, বলা বাহুল্য যে তখনই অভিব্যক্তি প্রভৃতি প্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম সকল সেই পদার্থকে বা সেই অণুপরমাণুকে উন্নতির পথে লইয়া চলিবার অবসর পায় এবং সেই অবসরের সদ্ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। উপরে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে ধর্ম্ম প্রত্যেক পদার্থে এবং প্রত্যেক অণুপরমাণুতে প্রতি মুহূর্ত্তেই সাময়িক অবস্থার উপযোগিতা আনয়ন করে। সুতরাং ধর্ম্মকে জগতের উন্নতির মূল বলিলে অন্যায় হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যদি কোন পদার্থের কোন অংশ কোন মুহূর্ত্তে পার্শ্ববর্ত্তী অংশের সহিত সমান উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ সেই অংশকে সেই স্থানের ও সেই মুহূর্ত্তের সাময়িক অবস্থার উপযোগী করিয়া এবং আবশ্যক হইলে

রূপান্তরে পরিণত করিয়া তাহাকে পুনরায় উন্নতির উচ্চ সোপানের অভিমুখীন করিয়া দেয়। একটী লৌহখণ্ডের এক অংশ হয়তো যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে উপযুক্ত, অপর অংশটী হয়তো সম্পূর্ণ লৌহত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্ম সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা সেই যন্ত্রাদির উপযুক্ত অংশকে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বা রক্তোৎপাদন প্রভৃতি রসায়ন কার্য্যের উপযোগী করিয়া উন্নতির অভিমুখে লইয়া চলিল এবং অপর অংশকে হয়তো পুনরায় মাটীতে পরিণত করিয়া বৃক্ষাদির জীবনধারণের উপযোগী করিয়া আর এক উপায়ে উন্নতির অভিমুখীন করিয়া দিল। কিন্তু এইটুকু স্থির যে জগতের প্রত্যেক অনুপরমাণু উন্নতির পথে চলিবেই। প্রত্যেক অনুপরমাণুকে প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই হইল ধর্ম্মের কার্য্য। সৃষ্টিবাষ্প হইতে মানবের অভিব্যক্তিই এই সত্যের একটী প্রত্যক্ষপ্রমাণ।

কেন্দ্রানুগ ভাবেরই অভিমুখে ধর্ম্মের প্রবণতা।

ধর্ম্ম সামঞ্জস্যের কারণেই আবশ্যক হইলে কখনও কেন্দ্রাতিগ শক্তির অধিকতর কার্য্যকারিতা সমর্থন করে বটে, কিন্তু মোটের উপর ধর্ম্মের কার্য্যফল আলোচনা করিলে তাহাদিগের মধ্যে কেন্দ্রানুগশক্তিরই কার্য্য-কারিতার প্রাধান্য অনুমিত হয়। কেন্দ্রানুগভাবেরই অভিমুখে ধর্ম্মের প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কেন্দ্রাতিগ শক্তির আধিক্য হইলে, পরমাণুগণের বহির্মুখী শক্তির প্রাধান্য হইলে, সমস্ত জগত বাষ্পাকৃতি হইয়া থাকিত; কাজেই কোন পদার্থই জগতের উন্নতিসাধনের সহায়তা করিতে পারিত না। কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রাধান্যের কারণেই সূর্য্য স্বীয় তেজ সংযত করিয়া প্রাণীগণের বাসোপযোগী হইবার পথে চলিয়াছে; নীহারিকামণ্ডলে

বাষ্পরাশি সংহত হইয়া গ্রহনক্ষত্রে পরিণত হইবার পথে চলিয়াছে। জগতে কেন্দ্রানুগ ভাবের এতটা প্রাধান্য যে আমরা অগ্নিসংযোগে জলকে বাষ্পে পরিণত করিলেও তাহা যথা সময়ে পুনরায় জলে পরিণত হইবে। ইহা হইতেই বুঝিতেছি যে কেন্দ্রাভিমুখী ভাব, অন্তর্দৃষ্টি বা বহির্মুখী ভাবের নিরোধ ধর্ম্মের প্রাণ। প্রকৃতিতেও দেখিতে পাই যে কোন কিছুকে এইরূপ কেন্দ্রমুখী বা বহির্বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিলে তাহার ধর্ম্ম স্পষ্টতররূপে প্রকাশ পায়। এই যে সূর্য্যের তেজ বহির্মুখী ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, ইহাতে তেজের ধর্ম্ম যত না স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেই তেজকে আমরা যখন আতস কাচের দ্বারা কেন্দ্রমুখী করিয়া আনি, তাহার বর্দ্ধিত দাহিকাশক্তি প্রভৃতিতে সেই তেজের ধর্ম্ম কত না উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পায়। জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া যদি উড়াইয়া দিই তাহাতে বাষ্পনিহিত ধর্ম্মের শক্তি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব না, কিন্তু সেই বাষ্পকে যদি নিরুদ্ধ করি, তবে তাহারই শক্তিতে বাষ্পীয় শকটও পরিচালিত হয়।

মনুষ্যের ধর্ম্মকে মুখ্যত ধর্ম্ম বলা যায়।

এতদুর পর্য্যন্ত জগতে কিরূপ কার্য্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া ধর্ম্মের প্রকাশ উপলব্ধ হয় তাহাই দেখিয়া আসিলাম। এখন আমাদিগের দেখিতে হইবে যে আমরা সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলি, আমরা যে সকল ভাবকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করি, সেই ধর্ম্ম সেই আদর্শ আসে কোথা হইতে। আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে অন্যান্য শক্তির ন্যায় ধর্ম্ম এক হইলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকারে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। এই ধর্ম্মকেই আমরা লোহে লোহের

ধর্ম্ম বলিয়া দেখি, জীবজন্তুতে জীবধর্ম্ম বলিয়া দেখি—বস্তুত প্রত্যেক পদার্থে সেই সেই পদার্থের স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করি। এই ধর্ম্মই আবার মনুষ্যে মনুষ্যধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহা এই মনুষ্যধর্ম্মকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকি। জড়পদার্থের ধর্ম্মকে আমরা সাধারণতঃ তাহাদের গুণ বলিয়া ব্যক্ত করি, মনুষ্যেতর জীবগণের ধর্ম্মকে তাহাদের স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করি; কেবল মনুষ্যে যে উন্নত আকারে ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই আমরা মুখ্যত ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করি এবং তাহারই শ্রেষ্ঠতম আদর্শের নিকট আমরা আমাদের মস্তক গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অবনত করি।

ঋষিরাই মানবধর্ম্মের আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন।

মানবের ধর্ম্ম কি এবং সেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ কি, ইহা লইয়া বহুকাল যাবৎ বাদবিতণ্ডা চলিয়াছে এবং সেই বাদবিতণ্ডা যে কত দিন পরে নিস্তব্ধ হইবে তাহাও বলা যায় না। স্পার্টার ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মলক্ষণের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তির প্রশংসা করিলেন, অপরদিকে ভারতের ঋষিরা ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। আমরা এখন কোন্ পথের পথিক হইলে ধর্ম্মপথের পথিক হইব? ধর্ম্মের যে সকল লক্ষণ ও কার্য্যের বিষয় উপরে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে ভারতের ঋষিরা যেরূপ মানবধর্ম্মের আদর্শ ও তাহার লক্ষণসমূহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অপর কোন দেশেরই মনীষীগণ সেরূপ করিতে পারেন নাই।

এই পুরাতন ভারতের পুরাতন ঋষিরা আলোচনা করিলেন যে এই ব্রহ্মচক্র কিসের উপর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁহারা দেখিলেন যে এক মহা-সামঞ্জস্যের উপর এই জগতসংসার সুনিয়মে চলিতেছে। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে মানবেরও অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য যে সকল কার্য্যের দ্বারা সাধিত হইবে, সেই সকল কার্য্যই ধর্ম্ম্য বা ধর্ম্মানুগত হইবে এবং সেই সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে মানব-গণকে উপদেশ দিলেন। এই সামঞ্জস্যভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া ঋষিরা মানবকে কর্ম্মফলের আকাজ্ঞাবিরহিত হইয়া ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে বলিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে আমরা সামঞ্জস্য-সাধক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম আপনিই আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া চলিবে; জগতের সামঞ্জস্যশক্তির সহিত আমাদিগের সাম-ঞ্জস্যশক্তি মিলিত হইয়া এক মহাশক্তিতে পরিণত হইবে। যে সকল কার্য্যের ফলে চিত্তবিক্ষেপ হয়, মানবের কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়া বৃথা কার্য্যে মানবকে নিযুক্ত রাখে, সেই সকল কার্য্যও যেমন ঋষিরা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়াছেন, সেইরূপ যে সকল কার্য্য জড়তা আলস্য প্রভৃতি আনয়ন করে, মানবকে ধর্ম্মানুগত কর্ম্ম হইতে নিবারিত করে, সেই সকল কার্য্যকেও তাঁহারা অধর্ম্ম্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অন্তরে দেখিতে পাই যে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিন মহাশক্তি নিয়তই কার্য্য করিতেছে। এখন যে কার্য্যের দ্বারা এই তিন শক্তির সামঞ্জস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধিত হইবে, তাহাই ধর্ম্ম্যতম—সেই কার্য্যই আমাদিগের

সামঞ্জস্যসাধক কার্য্যই ধর্ম্ম।

আদর্শস্থলে রাখিলে তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারিব। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ এই সামঞ্জস্য সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্নোৎপাদক বলিয়া তাহাদিগকে কেবল অধর্ম্ম নহে, কিন্তু নিত্য শত্রু বলা হইয়াছে।

সামঞ্জস্যের বিঘ্নকারক বলিয়া চৌর্য্য প্রভৃতি অধর্ম্ম।

এখন এই আদর্শকে ভিত্তি করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে স্পার্টার চৌর্য্যসমর্থক নিয়ম প্রকৃত ধর্ম্মানুগত হইতে পারে না, কারণ ইহাতে চিত্তবিক্ষেপ আসিতেই হইবে। তবে সময়বিশেষে ইহার উপযোগিতা ছিল, সেই কারণেই ইহা সেই সময়ে ধর্ম্মের আবরণ পরিয়া কিছুকালের জন্য ধর্ম্ম্য বলিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু স্থায়ীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না। প্রকৃত ধর্ম্ম নিত্য—তাহার পরিবর্ত্তন নাই। এই যে ইউরোপীয় জাতিগণ মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছে, ধর্ম্মের আদর্শে বিচার করিলে ইহাও অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, কারণ ইহার ফলে এই ধরণীমণ্ডলের কি ভয়ানক চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছে। এই আদর্শের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারি যে আমোদের জন্য বা অহঙ্কারের বশে শীকারে বহির্গত হইয়া নিরীহ প্রাণীদিগের হত্যাসাধন প্রকৃত পক্ষে অধর্ম্ম, কিন্তু শরীরধারণের জন্য মাংসাহার অধর্ম্ম হইতে পারে না, বরঞ্চ তাহা ধর্ম্ম্য কারণ তাহাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। আবার একজন যুদ্ধপ্রিয় চঞ্চলচিত্ত ক্ষাত্রধর্ম্মী বীরের পক্ষে শীকার আপেক্ষিকভাবে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কারণ সেইরূপ শীকারেই তাহার অন্তরে উন্মেষিত জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য সাধিত হইবে। ঋষিরাও ইহা বুঝিয়াই ইহাকে

রাক্ষস ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেইরূপ পিশাচপ্রকৃতি লোক যদি আমোদের জন্য নানা নিষ্ঠুর উপায়ে জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়, তবে তাহা বাস্তবিকই অধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু ঋষিরা তাহারও মধ্যে সামঞ্জস্যমূলক মূল ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিয়া এইরূপ কার্য্যকে তামস ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ কার্য্য করিতে করিতে এমন এক আঘাত আসিবেই যে সেই আঘাতের ফলে সেই পিশাচপ্রকৃতি লোকেও সামঞ্জস্যের বা ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ সহায়।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে ধর্ম্মই জগতের উন্নতির মূল। ঋষিরা ইহা দৃষ্টি করিয়া যে সকল কার্য্যের ফলে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হয় এবং সুতরাং উন্নতি হয়, সেই সকল কার্য্যকেই মানবধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। আজ আমার কেহ অনিষ্ট করিল, আমি তাহার প্রতিশোধ লইলাম, তাহাতে উন্নতি হইল না। কিন্তু আমি যদি তাহাকে ক্ষমা করি, তবে সেই ক্ষমাগুণে অনিষ্টকারীর অন্তর্দৃষ্টি ফুটাইয়া দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও শক্তিসমূহকে কেন্দ্রানুগ করিয়া যে উন্নতি সাধিত করিলাম, তাহার বিনাশ নাই। এইভাবে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা ধৃতি, ক্ষমা, সরলতা প্রভৃতি গুণকে ধর্ম্মের লক্ষণ স্থির করিলেন। এইরূপ উন্নতিসাধনের উপায় বলিয়াই চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে দূরে লইয়া যাইতে উদ্যত বিষয়সমূহ হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী করাকেই ঋষিরা ধর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা সহায় বলিয়া দিয়াছেন। চিত্তবৃত্তিসমূহকে

এইরূপে নিরুদ্ধ করিয়া কেন্দ্রানুগ করিলে প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণগুলির, অর্থাৎ কিরূপ কার্য্য করিলে ধর্ম্ম বা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় তাহার জ্ঞান অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ঋষিপ্রচারিত ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঋষিপ্রচারিত ধর্ম্মের লক্ষণগুলি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রমাণ এই যে স্পার্টার চৌর্য্যসমর্থক ধর্ম্ম এবং তদনুরূপ ধর্ম্মপ্রতিরূপ সকল আজ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঋষিদিগের ধর্ম্ম আজও আমাদিগকে সঞ্জীবনমন্ত্রে অনুক্ষণ দীক্ষিত করিতেছে। চৌর্য্যবৃত্তির প্রয়োজন যখন ফুরাইয়া গিয়াছিল, তখন ধর্ম্মই তাহাকে সরাইয়া দিয়া স্পার্টাবাসীদিগকে উন্নততর ধর্ম্মলক্ষণ স্বীকার করাইয়া উন্নততর অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিল। কিন্তু আমাদিগের দেশে যে ধর্ম্মলক্ষণগুলি প্রচারিত হইয়াছিল, সেগুলি এতদূর সত্য যে আজ শতসহস্র যুগের পরেও সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতবাসীদিগকে সত্ত্বগুণের অধিকারী করিয়া এই দেশকে বিনাশের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

উন্নতিরূপ উদ্দেশ্যের নিয়ন্তা ঈশ্বর।

ধর্ম্মের ফলে উন্নতি বলিয়া আসিয়াছি। এই উন্নতির অর্থে আমরা বুঝি সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন, শরীর মন ও আত্মার মঙ্গলসাধন। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে উন্নতি একটী উদ্দেশ্যমাত্র অর্থাৎ উন্নতি আপনাপনি সংঘটিত হইবার বস্তু নহে, কোন ইচ্ছাবিশিষ্ট পুরুষের লক্ষ্য হওয়া চাই। উন্নতিরূপ উদ্দেশ্য সাধন কোন অন্ধশক্তির কার্য্য হইতে পারে না। ধর্ম্মের সামঞ্জস্যশক্তি দ্বারা যখন সমগ্র জগত উন্নতির পথে পরিচালিত হই-

তেছে, তখন বলা বাহুল্য যে এই শক্তিকে এক ইচ্ছাময় পুরুষ জগতের উন্নতিসাধনে পরিচালিত করিতেছেন। এখন যে শক্তি সৃষ্টির আদি অবধি কার্য্য করিতেছে এবং সৃষ্টির অন্ত অবধি কার্য্য করিবে, কিন্তু সৃষ্টি না থাকিলে যে শক্তির অস্তিত্বই থাকিতে পারিত না, যে শক্তি আব্রহ্মস্তম্ব বিশ্বজগতকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শক্তিকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা সেই জগতস্রষ্টা বিশ্বপাতা ইচ্ছাময় পরমপুরুষ পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কাহাতে সম্ভবে? তাই ঋষিরা ঈশ্বরকে ধর্ম্মাবহ বলিয়াছেন। তাঁহা হইতেই ধর্ম্ম সুধাস্রোতের ন্যায় নামিয়া আসিয়াছে। যে ধর্ম্ম জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে, সেই ধর্ম্মকে ঈশ্বর নিয়মিত করিতেছেন, সেই ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু ঈশ্বর, তাই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না। ধর্ম্মের আবরণ লইয়া অনেক উপধর্ম্ম রচিত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে সত্যধর্ম্মের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ ও পিতা।

ঈশ্বর কেবল ধর্ম্মাবহ নহেন, তিনি ধর্ম্মাবহ ও পিতা। যে দয়াল প্রভু জগতসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এমন এক ধর্ম্মশক্তি প্রেরণ করিলেন যে সেই শক্তি এই মহান ব্রহ্মচক্রকে উন্নতির পথে অবিশ্রাম লইয়া চলিয়াছে, জগতের মধ্যে এক আশ্চর্য্য শান্তি আনয়ন করিয়া জগতকে সুধাময় করিয়া রাখিয়াছে, সেই দয়াল প্রভুকে পিতা বলিব না তো আর কাহাকে পিতার আসনে বসাইব? তিনি যেমন জ্ঞানের বিষয়সকল আমাদের চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানলাভের অধিকারী করিয়া-

ছেন, সেইরূপ আমাদের অন্তরে ধর্ম্মশক্তি প্রেরণ করিয়া আমাদের আত্মার দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার মহান অধিকার দিয়াছেন। ইহাতেও যদি তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া গৌরব অনুভব না করি, তবে আমাদের মুক্তির কোন আশাই থাকে না। ঘোর করালচ্ছায় প্রলয়ের অবসানে যে দেবতা সুবিমল শান্তির মলয় বায়ু প্রবাহিত করেন; ধর্ম্ম হইতে দূরে পড়িয়া যখন আমাদের আত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন যে প্রাণের প্রাণ আমাদিগকে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দ্বারা সেই ব্যাকুলতা দূর করিয়া দেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিব, কাহার চরণতলে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিব?

হে দেব, হে পিতা, পাপসকল মার্জ্জনা কর। যাহা ভদ্র, যাহা প্রার্থনা। কল্যাণ তাহাই আমাদিগের মধ্যে প্রেরণ কর। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা
নোঽসি গ্রন্থে ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ ও পিতা নামক
অষ্টম ভাব সমাপ্ত

—ঃওঁঃ—

নবমভাব—ঈশ্বর শুভদাতা ও পিতা।

ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর সুখকল্যাণের আকর কল্যাণ ও কল্যাণতর তোমাকে নমস্কার।

ঈশ্বর শুভদাতা ও পিতা।

ঈশ্বর শুভদাতা ও পিতা। তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড নিশ্বসিত হইয়াছে। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় আমাদিগের চারিদিকেই বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এক একটী মঙ্গল নিয়মের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে শতকোটী জন্ম কাটিয়া যাইবে, তথাপি তাঁহার মঙ্গলভাবের অন্ত পাওয়া যাইবে না। তিনি একটী আকর্ষণ.শক্তি জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে যে সমগ্র জগতে কি আশ্চর্য্য মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? তিনি একটী ক্ষুধাবৃত্তি পাঠাইলেন, আর তাহার ফলে জীবজন্তুসকল জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত হইতে হইতে দেবত্বের পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত হইতে চলিয়াছে! আলোচনা করিলে প্রতি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইতে পারি।

অনেক ঘটনাতে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব বুঝিতে পারি না।

জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যে গুলির মধ্যে অনেক সময়ে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব বুঝিতে পারি না বলিয়া তাঁহাকে শুভদাতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। ভূমিকম্প হইল, বন্যা হইল, মহামারী আসিল, বাড়ীঘরদুয়ার সকল ভূমিসাৎ হইল, গ্রামপল্লী

ভাসিয়া গেল, দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল—এইরূপ ঘটনাসমূহের মধ্যে যে মঙ্গলভাব লুকায়িত থাকে, সকল সময়ে আমরা তাহা ধরিতে না পারিয়া ঈশ্বরকে প্রাণ খুলিয়া শুভদাতা পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি না।

ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রলয়ঙ্কর ঘটনাসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? যে সময়ে আমরা আমাদের ক্ষণিক সুখের সঙ্গে মঙ্গলভাবকে মিশাইয়া ফেলি, মঙ্গল মনে করিয়া ক্ষণিক সুখকেই বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করি, তখনই আমরা ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব অনুভব করিতে পারি না। প্রকৃত কথা এই যে আমরা অধিকাংশ সময়ে ক্ষণিক সুখটুকু পাইলেই সন্তুষ্ট হই—সেই ক্ষণিক সুখের সঙ্গে আমাদের কল্যাণ জড়িত থাকিলে ভালই, আর জড়িত না থাকিলেও আমরা সে দিকে বড় বেশী লক্ষ্য করিতে চাহি না। আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি—সুন্দর অট্টালিকাতে নিরাপদে অবস্থান, ভাল আহারাদি লাভ করা ইত্যাদি—ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনাতে সেই সকল সুখের অন্তরায় ঘটিতে পারে; আমাদের ইহলোকের যে জীবন লাভ করিয়া নানাপ্রকার সুখের আস্বাদ লাভ করিতেছি, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনায় সেই ইহলোকের জীবনেরই অবসান হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া ঈশ্বরের করুণার কথা ভুলিয়া যাই, তাঁহাকে দয়াময় পিতা বলিয়া আর ডাকিতে চাহি না, তাঁহার বিদ্রোহী সন্তানের ন্যায় আচরণ করিতে থাকি।

প্রলয় ঘটনাতে মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করি না কেন?

প্রকৃতিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে ক্ষণিক সুখের উপর সকল সময়ে আমাদিগের মঙ্গল নির্ভর করে না। বরঞ্চ ইহা দেখি যে প্রকৃত সুখের সঙ্গে প্রকৃত মঙ্গল সম্পূর্ণ বিজড়িত থাকে। কুইনাইন বা চিরেতা অত্যন্ত তিক্ত বলিয়া তাহা থাইলে আমাদের জিহ্বায় ক্ষণিক সুখের ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু জ্বর প্রভৃতি অবস্থায় সেই কুইনাইন বা চিরেতা সেবন করিলে আমাদিগের মঙ্গল হয়। এস্থলে জ্বরকালে তিক্তসেবনেই আমাদিগের প্রকৃত সুখ এবং তাহাতেই আমাদিগের কল্যাণ। সেই-রূপ যদি কোন বালক পুষ্করিণীর জলে নামিলে ডুবিয়া যাইবে না ভাবিয়া পুষ্করিণীতে নামিতে অগ্রসর হয়, তাহাতে শীতল জলের স্পর্শে তাহার ক্ষণিক সুখ হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাহার জীবননাশ-রূপ গুরুতর অমঙ্গলের সম্ভাবনা নিশ্চিত। এখন যদি তাহার পিতা তাহাকে পুষ্করিণীতে নামিতে দেখিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক সেই কার্য্য হইতে নিবারিত করেন, তবে সেই বালকের স্বাধীনতা নষ্ট হওয়াতে এবং শীতল জলের স্পর্শজনিত সুখের অভাব হওয়াতে তাহার ক্ষণিক সুখলাভের ব্যাঘাত ঘটিল বটে, আর সেই কারণে বালক হয়তো তাহার পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা বলিয়া ডাকিতে চাহিল না। কিন্তু সেই পিতা যে বালককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া তাহার মঙ্গল সাধন করিলেন এবং তাহাতেই যে বাল-কের প্রকৃত সুখ সম্পাদন করিয়া পিতার উপযুক্ত কার্য্য করিলেন, ইহা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিবে? রোগী ব্যক্তি তাহার

ক্ষণিক সুখের উপর মঙ্গল নির্ভর করে না—প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত মঙ্গল দৃঢ়বন্ধনে জড়িত।

জিহ্বার সুখটুকু পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু চিকিৎসক পরিণামে তাহার কিসে সুখ হইবে অর্থাৎ কিসে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে তাহাই দেখেন। বালকেরা তাহাদের সম্মুখে যে সুখটুকু দেখিতে পায়, তাহাই তাহারা গ্রহণ করিতে চাহে, কিন্তু পিতামাতা বিস্তৃত স্থান ও প্রসারিত কাল ধরিয়া পরিণামে যাহাতে সুখ হয় অর্থাৎ যাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

বালকদিগের ন্যায় আমরাও যে সকল কার্য্যের ফলে সদ্যসদ্য সুখের আস্বাদ পাই, সেই সকল কার্য্য করিতেই আমরা সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হই। সেই সকল কার্য্য করিবার অবসর পাইলে এবং সেই কার্য্যের ফলে আমাদিগের ক্ষণিক সুখলাভ ঘটিলেই আমরা আমাদিগের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু যে দেবতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের জন্মদান করিয়াছেন, যিনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মঙ্গল নিয়মে বিশ্বজগতকে বাঁধিয়া লালনপালন করিতেছেন, যিনি আমাদিগের জ্ঞানদাতা ও পিতা, যিনি সৃষ্টির আদ্যন্তমধ্য সকলই প্রত্যক্ষ জানিতেছেন, তিনি আমাদিগের ক্ষণিক সুখের জন্য আমাদিগকে প্রকৃত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ফলে যদি দুই চারিটি কার্য্যে আমরা তখনি তখনি সুখ প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলেই জগতের সেই স্রষ্টা পাতা পরমপিতা পরমেশ্বরকে পিতা বলিতে অস্বীকার করা কত দূর কৃতঘ্নতা! আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় না দিয়া তাঁহা হইতে দূরে থাকিব?

ঈশ্বরের মঙ্গল ব্যবস্থাতে পিতৃভাব সুব্যক্ত।

আমরা দূরে থাকিতে চাহিলেও সেই দয়াল পিতা তো আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি যেমন আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, আমরাও যে তেমনি তাঁহার প্রাণের প্রাণ। তিনি আমাদের ক্ষণিক সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমাদিগের পরিণামসুখেরই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য সকল ঘটনা নিয়মিত করিতেছেন। সেই সুখই সমগ্র জগতের সুখের সহিত জড়িত এবং তাহাতেই আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গল। এই মঙ্গলময় সুখের ব্যবস্থাতেই ঈশ্বরের মহান্ পিতৃভাব সুব্যক্ত রহিয়াছে।

আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার কারণে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করিতে পারি না।

উপরে আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বলিয়াই আমরা অনেক সময়ে ভগবৎপ্রেরিত ঘটনাসমূহের মধ্যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইতে অসমর্থ হই। বাস্তবিক ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, নির্ব্বাক হইতে হয় যে কি বিরাট কাল পড়িয়া আছে আর কি বিরাট স্থান পড়িয়া আছে। আমরা যেটুকু স্থানের ভালমন্দ বিচার করিতে পারি, আমরা যেটুকু কালের বিষয় ভাবিতে পারি, সেই কাল ও সেই স্থান এই বিরাট কাল ও স্থানের নিকট কত অল্প— এত অল্প যে আমরা তাহা কল্পনাতেও উপলব্ধি করিতে পারি না। পুষ্করিণীতে অবতরণ করিতে উদ্যত বালক যেমন যেখানে দাঁড়াইয়া থাকে সেই স্থানটুকু ও সম্মুখের জলটুকু দেখে, এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যে সুখটুকু পাইবে তাহারই বিষয় ভাবে, কিন্তু তাহার পিতার প্রসারিত দৃষ্টি সেই জলের নিম্নে যে গভীর খাদ আছে তাহা এবং

সেই কয়েক মুহূর্ত্তের পরবর্ত্তী কালেরও ফলাফল দেখিতে পায়, সেইরূপ আমরা এক হাত, দশ হাত, এক মাইল, একশত মাইল এইরূপ পরিমিত স্থানে এবং একদিন, একশত বৎসর, দুইশত বৎসর এইরূপ পরিমিত কালে কোন ঘটনার ফলাফল জানিলেও জানিতে পারি; কিন্তু সেই স্থানের ও সেই কালের অতিরিক্ত স্থান ও কালেতে যে সেই ঘটনার কি ফলাফল হইবে তাহা জানিতে পারি না। যাঁহার জ্ঞান সৃষ্টির আদ্যন্ত মধ্যে বিদ্যমান, তিনিই তাহা জানিতে পারেন। তিনিই জানিতে পারেন যে আমাদের প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত মঙ্গল কিসে। আমরাও যখন সমগ্র ব্রহ্মচক্রেরই একটী অঙ্গরূপে সৃষ্ট হইয়াছি, তখন জগৎপাতা পরমেশ্বর সমগ্র ব্রহ্মচক্রের সুখ ও মঙ্গলের সহিত আমাদের সুখ ও মঙ্গল যাহাতে সংসাধিত হয় তাহারই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্ম অবলম্বনই আমাদের সুখ ও মঙ্গললাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ধর্ম্মকে অবলম্বন করাই ব্রহ্মাণ্ডের সুখ ও মঙ্গলের সহিত আমাদের প্রত্যেকের সুখ ও মঙ্গল সংসাধিত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বোধ হয় একমাত্র, উপায়। আমরা যদি ক্ষণিক সুখের লোভে কেন্দ্রাতিগ শক্তির সহায়তা গ্রহণ করি, তবে ধর্ম্মের সামঞ্জস্যশক্তি নিশ্চয়ই ত্বরিতগতিতে তাহাকে প্রতিহত করিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রানুগ শক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য করিবে। আবার যদি আলস্য প্রভৃতির বশে একমাত্র কেন্দ্রানুগ শক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করি, তাহা হইলেও ধর্ম্ম স্বীয় সামঞ্জস্যশক্তি দ্বারা সেই কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রভাব বিধ্বস্ত করিয়া দিবে। এই উভয় স্থলেই আমরা ক্ষণিক সুখ লাভ করিলেও পরিণামে

প্রকৃত সুখের পরিবর্তে দুঃখ কষ্টই লাভ করিব। অবশ্য ধর্ম্ম যথা-সময়ে সামঞ্জস্যবিধানের দ্বারা দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া আমাদিগকে সুখের অধিকারী করিবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমরা যদি ক্ষণিক সুখের পশ্চাতে ধাবমান না হইয়া প্রথম হইতেই জগতের সামঞ্জস্যকে অনু-সরণ করিয়া আপনাদিগের ভিতরেও সামঞ্জস্য বিধান করি, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত মঙ্গল যুগপৎ লাভ করিব। তাই ধর্ম্মকেই প্রকৃত সুখ ও মঙ্গলের মূল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বলা বাহুল্য যে এই ধর্ম্মেরও কেন্দ্র ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেই সুখ ও মঙ্গলের সামঞ্জস্যবিধান অতি সহজ হয়।

ঈশ্বর মঙ্গলের সঙ্গে ক্ষণিক সুখেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদিগের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত আছেন বলিয়া যে সেই মঙ্গলের সঙ্গে ক্ষণিক সুখেরও ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। তিনি যে ক্ষণিক সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমাদের কল্যাণেরই অঙ্গ। আমরা যখন জন্মলাভের পর মাতার স্তন্যপান করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকি, তখন আমাদিগের যেমন প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয়, সেইরূপ আমরা ক্ষণিক সুখও প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হই। বাল্যকালে যখন প্রভাতের সূর্য্যকিরণের সঙ্গে আমরা লুকোচুরি খেলিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকি, তখন একদিকে যেমন আমাদিগের স্বাস্থ্যলাভের দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয়, অপরদিকে তেমনি সেই স্বাস্থ্যলাভের ফলেই কত না সুখ ও আনন্দ লাভ করি। যৌবনে যখন আমরা বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালিত করিয়া আমাদিগের উন্নতির পথ হইতে রাশি রাশি বিঘ্ন সকল অপসারিত করিতে থাকি, তখন

আমরা যতই দ্রুতপদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকি, ততই এক একটী অন্তরায় অপসারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কি অপার আনন্দ-সাগরেই না অবগাহন করি। আবার বৃদ্ধ বয়সে যখন পলিতকেশ গলিতদন্ত অবস্থায় পরলোকে প্রস্থানের জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়া বসি, তখন একদিকে পুত্রপৌত্রাদিকে ধর্ম্মপথের পথিক হইতে দেখিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তের কার্য্যপ্রসার দেখিয়া আনন্দে পরিতৃপ্ত হই, অপরদিকে আমরা আপনারাও ঈশ্বরের সহিত সংস্পর্শসুখের ছায়া অনুভব করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই। আমা-দিগের জীবন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিব যে তাহা প্রকৃতই একটী সুখ ও মঙ্গলের ধারা। এই সুখ ও মঙ্গলের প্রবাহ এতদূর স্বাভাবিক যে তাহার জন্য সুখদাতার নাম আমা-দের মনেই আসে না। কিন্তু সুখের কারণ ভবিয়া যখন অসুখের কারণকে আলিঙ্গন করি এবং সেই কারণে যথাযুক্ত আঘাত প্রাপ্ত হই, তখনই নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকেও সকল দুঃখের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার পিতার সিংহাসন কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করি!

যাঁহা হইতে মঙ্গল ও সুখ এক অনুপম আনন্দমূর্ত্তিতে এই বিশ্বসংসারে নামিয়া আসিয়াছে, যাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলে আমাদিগের সকল কার্য্যেই মঙ্গলের সহিত সুখ অবি-চ্ছিন্ন থাকিবে, এস তাঁহাকে ঋষিদিগের ভাষায় নমস্কার করিয়া জীবনকে ধন্য করি—

নমস্কৃতি।

ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা
নোঽসি গ্রন্থে ঈশ্বর শুভদাতা ও পিতা বিষয়ক
নবম ভাব সমাপ্ত ।

—ঃওঁঃ—

দশমভাব—নমস্কৃতি ।

তোমারে নমস্কার, হে পিতা, তোমারে নমস্কার। হে দেবাধিপতি, তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনাকে আপনিই জানিতেছিলে, তোমাকে নমস্কার। সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কি-ই বা ছিল? তখন কি কেবলই এক মহান আকাশ ছিল? জানি না। তখন কি এক মহান কালই ছিল? জানি না। তখন অন্য যাহাই কেন থাকুক না, হে ইচ্ছাময় পরমপুরুষ, এইটুকু জানিতেছি যে তোমারই সত্তা অব্যক্ত সুনীল আকারে ঢলঢলভাবে সমগ্র প্রকৃতিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল।

ইচ্ছাময় পুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার।

হে ইচ্ছাময় মহান পুরুষ, কে জানে যে তুমি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া আপনার ধ্যানে আপনি নিমগ্ন ছিলে? তোমার নিত্য বর্ত্তমান জ্ঞানে যে মুহূর্ত্তে তুমি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে, সেই মুহূর্ত্তেই কি আশ্চর্য্য ঘটনাই না সংঘটিত হইয়াছিল। স্বচ্ছ হ্রদের মধ্য হইতে যেমন পদ্মকোরক আবির্ভূত হইয়া এবং যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক সুবাসে আমোদিত করিয়া তুলে, সেইরূপ তোমার ইচ্ছাতে তোমারই সুবিমল সত্তা হইতে এই সমগ্র ব্রহ্মচক্রকে গর্ভস্থ করিয়া সুনির্ম্মল প্রকৃতি প্রকাশিত হইল, আর তুমি সেই প্রকৃতিতে ব্যক্ত আকারে উদ্ভাসিত হইলে। তোমাকে নমস্কার। তোমারই ইচ্ছাতে তোমারই সত্তা হইতে এই প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া কোটী কোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের জন্মদান করিয়াছে। তোমারই প্রতিষ্ঠিত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মঙ্গল

নিয়মে আকর্ষণ প্রভৃতি কত মঙ্গলবিধায়ক শক্তিসকল সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। তোমারই সৃষ্টির সুবাসে দিকসকল আমোদিত হইয়া রহিয়াছে।

বিধাতা পুরুষকে নমস্কার।

হে বিধাতা পুরুষ, মাতা যেমন নবজাত শিশুকে অহর্নিশি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া লালনপালন করেন, সেইরূপ তুমি সেই আদিকাল অবধি তোমার নিত্য নবজাত সৃষ্টিকে স্বীয় ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। তোমাকে নমস্কার। মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় সহস্র কোটী জ্বলন্ত সূর্য্য তোমারই চক্ষুস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া নিয়তই এই জগতসংসারকে রক্ষা করিতেছে। হে প্রাণের প্রাণ, এই বিশ্বজগত তোমারই প্রাণের অভিব্যক্তি, তাই এই বিশ্বজগতে প্রাণের কি খেলাই না চলিয়াছে। কোটী কোটী যুগ ধরিয়া কোটী কোটী প্রাণীর উদ্ভব হইতেছে, তবু তাহার অন্ত নাই। তোমাকে নমস্কার।

জ্ঞানদাতা গুরু পরমেশ্বরকে নমস্কার।

হে জ্ঞানদাতা গুরু, তুমি আমাদিগকে এক আশ্চর্য্য জ্ঞানধনের অধিকারী করিয়াছ। সেই জ্ঞান যে কি তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সেই জ্ঞানের দ্বারা তুমি যে কোথায় কোন্ বস্তু, কোথায় কোন্ শক্তি আমাদিগের জন্য লুক্কায়িত রাখিয়াছ, সেগুলি একে একে জানিতে পারিতেছি। এই জ্ঞানের যে কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। যতই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হই, ততই সেই পথ সম্মুখে অনন্তপ্রসারিত দেখিতে পাই। এই জ্ঞানের দ্বারা কোথায় সূর্য্য, সূর্য্যের উপর সূর্য্য, সেই সকলের তত্ত্ব অনন্ত সাগরের পার্শ্বে একটী

বালুকাকণা স্বরূপ এই ক্ষুদ্র দেহকুটীরে বসিয়া অনায়াসে আয়ত্ত করিতেছি। তোমাকে নমস্কার। হে ভগবান, আমাদের অন্তরে তুমি যে চিন্তাশক্তি দিয়াছ, তাহা দ্বারা আমরা যে কত আশ্চর্য্য কার্য্য-সকল সংসাধিত করিতেছি, তাহা ভাবিয়া কূলকিনারা পাই না। কোথায় কোন্ জলপ্রপাত পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে শতসহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইতেছে, বুদ্ধিবলে তাহার অন্তর্নিহিত তেজ নিষ্কাশিত করিয়া আলোক উৎপাদন প্রভৃতি কত প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি। কত প্রকার পদার্থ হইতে তড়িত সংগ্রহ করিয়া কতশত বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি। কোথায় কত বিভিন্ন পদার্থের খনি রহিয়াছে, বুদ্ধিবলে সেই সকল খনি হইতে রাশি রাশি পদার্থ সকল বাহির করিয়া জগতের মঙ্গলজনক ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক কত না কার্য্যে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছি। হে জ্ঞানময় পরমেশ্বর, তোমারই প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। এই জ্ঞান দিয়া আমার জীবনকে নিত্য পরিপূর্ণ রাখ।

রুদ্রমূর্ত্তি মহাদেবকে নমস্কার।

হে রুদ্রমূর্ত্তি বিশ্বপতি মহাদেব, আমরা যখন স্বীয় কর্ম্মদোষে মোহাচ্ছন্ন হইয়া তোমার প্রলয়ঙ্কর করালমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হই, তখন তাহারই মধ্যে তোমার প্রসন্নমূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান কর। হে পিতা, তুমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইও না— তুমি বিরক্ত হইলে আর কাহার রাজ্যে পলায়ন করিব? এ যে সমস্তই তোমারই রাজ্য। তোমাকে নমস্কার। প্রলয়ের অন্ধকারে আমাদিগের প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তোমারই নিকট

এই কাতর প্রার্থনা যে তুমি তোমার রুদ্রমূর্ত্তি সংহরণ করিয়া তোমার অভয় মূর্ত্তি আমাদিগের সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে থেকো। হিমঋতুর কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া প্রভাততপনকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতে দেখিলে আমাদিগের যে আনন্দ হয় তাহা প্রলয়ের পর তোমার অভয়মূর্ত্তিদর্শনে যে আনন্দ হয় তাহার ক্ষীণতম আভাস মাত্র। আমার দুঃখ আসুক ক্ষতি নাই, শোকতাপে জর্জ্জরিত হই ক্ষতি নাই, যদি তাহার ফলে তোমার করুণা আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে, যদি তোমার দয়াময় মূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। আমি জানি যে আমরা যাহাকে প্রলয় মনে করিয়া ভীত হই, সেই প্রলয়ও যেমন তুমিই প্রেরণ করিয়াছ, সৃষ্টিস্থিতিও তেমনি তোমারি আদেশে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; আর ইহাও জানি যে সেই প্রলয়ের মধ্যেই তুমি সৃষ্টি ও স্থিতির মূল নিহিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যাহাকে দুঃখদৈন্য মনে করি, তাহারই মধ্যে যে তুমি সুখ, মঙ্গল ও আনন্দের উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছ। সেই সৃষ্টির আদিকালে কি ভয়ানক প্রলয়ঝটিকা অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল, আজ আমরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। কিন্তু সেই প্রলয়-ঘটনা সমূহের ফলেই পৃথিবী শীতল হইল, বসুন্ধরা শস্যে জীবে পরি-পূর্ণ হইল, মেঘ বারি বর্ষণ করিল, বায়ু সঞ্চলিত হইল। আবার যখন এই পৃথিবীর অধিবাসীগণ উন্নততর লোকে গমনের জন্য প্রস্তুত হইল, তখন তোমারই কৃপায় প্রলয়েরই দক্ষিণ হস্ত মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে লোকান্তরে উপনীত করিতে লাগিল। তুমি যখন প্রলয়ের মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান আছ, তখন আমার

ভয়শোক দুঃখ দৈন্য সকলই তোমারই তেজে দগ্ধ হইয়া যাউক। তোমাকে নমস্কার।

ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরকে নমস্কার।

হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর, হে দয়াল পিতা, তোমারে নমস্কার, হে পিতা, তোমারে নমস্কার। তুমি যখন আমাদিগকে পরলোকে উপনীত করিবার জন্য মৃত্যুকে পাঠাইয়া দাও, তখন সেই অজ্ঞাত প্রদেশে যাইবার জন্য আমরা ভয়ে অস্থির হইলে আমাদিগকে অভয় দিবার জন্য তুমি তোমার দক্ষিণহস্ত ধর্ম্মকে প্রেরণ কর। ধর্ম্মের সাহায্যে আমরা কত সহজে পরলোকে উপনীত হইয়া তোমার মধুময় স্নেহময় মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া কত না আনন্দ লাভ করি। তোমাকে নমস্কার। আমাদের মঙ্গলেরই জন্য তুমি তোমার ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মকে যেন আমরা পরিত্যাগ না করি। হে প্রাণের প্রাণ, অন্তরতম পরমাত্মন্, আমার আত্মাতে তুমি এইটুকু শক্তি দাও যে তোমার উপরে, তোমার দয়াল পিতার নামের উপরে আমরা যেন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। এইটুকু শক্তি দাও যে আমরা যেন অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি, আমাদের প্রতি নিশ্বাসের সহিত মিলাইয়া লইতে পারি যে আমাদের পরমপিতা, জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় পিতা। তুমি আমাদের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা কিছু প্রেরণ করিবে, তাহা আমাদের মঙ্গলেরই জন্য প্রেরণ করিবে এবং যাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইবে, তাহাই তুমি প্রেরণ করিবে—তাহা ব্যতীত আর কিছুই যে তুমি প্রেরণ করিবে না। হে শান্তিদাতা পিতা, তোমার দর্শন পাইয়া দুঃখ শোক আমা-

দিগের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করুক, সুখশান্তি আমাদিগের নিত্য সহচর হউক। হে প্রাণের আরামপ্রদ মধুময় পুষ্প, আমাদিগকে তোমার সংস্পর্শজনিত সুগন্ধ বিস্তার করিয়া চারিদিক আমোদিত করিবার অধিকার দাও। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রে হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে জগতপিতা প্রাণপতি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি—তুমি আমাদিগের নমস্কার গ্রহণ কর।

বৈদিক মন্ত্রে নমস্কৃতি।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার। আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। হে দেব, হে পিতা, পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখকল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত ওঁ পিতা নোঽসি গ্রন্থে দশম ভাব ও নমস্কৃতি সমাপ্ত।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

নিবেদন।

সময়ে সময়ে কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন আমাদের মনকে বড়ই আন্দোলিত করিয়া তুলে, তন্মধ্যে একটী হইতেছে ঈশ্বর নিষ্ঠুর অথবা দয়ালু, তিনি আমাদিগের পিতা অথবা প্রলয়প্রিয় একটী রাক্ষস। এই প্রশ্ন অন্ততঃ আমাকে কিছুকালের জন্য পীড়া দিয়াছিল। পরে যখন ভগবানের কৃপায় এই প্রশ্নের আমার মনের শান্তিপ্রদ কয়েকটী উত্তর পাইলাম, তখন আমার মনে হইল যে ভগবৎপ্রদত্ত সেই উত্তরগুলি প্রচার করা আমার কর্ত্তব্য। আমি জানি যে আমার মত আরো অনেককে এই প্রশ্ন বড়ই কষ্ট দিয়াছে ও দিতেছে। আমার প্রচারিত উত্তরগুলি সেই সকল প্রশ্নপীড়িত ব্যক্তির কিছু-না-কিছু কাজে আসিতে পারে, এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া উত্তরগুলি প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।

যোড়াসাঁকো, কলিকাতা,
১১ই মাঘ, ১৮৩৬ শক,
২৫ শে জানুয়ারি, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ,
সোমবার।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।